# النفع الفريد
## في ظل بداية المجتهد

# আন নাফউল ফারীদ

## ফি জিল্লি বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

**প্রিন্টিং ও বাঁধাইঃ**

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

**প্রাপ্তিস্থানঃ**

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং

রেলইয়ার্ড, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

**যোগাযোগঃ**

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

Email: almunirabdullah@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৮০ টাকা মাত্র।

# লেখকের কথা

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর বুঝ প্রদান করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّ غَرَضِي فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْ أُثْبِتَ فِيهِ لِنَفْسِي عَلَى جِهَةِ التَّذْكِرَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِأَدِلَّتِهَا، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى نُكَتِ الْخِلَافِ فِيهَا، مَا يَجْرِي مَجْرَى الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ لِمَا عَسَى أَنْ يَرِدَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا فِي الشَّرْعِ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي الْأَكْثَرِ هِيَ الْمَسَائِلُ الْمَنْطُوقُ بِهَا فِي الشَّرْعِ، أَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ تَعَلُّقًا قَرِيبًا، وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهَا، أَوِ اشْتَهَرَ الْخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إِلَى أَنْ فَشَا التَّقْلِيدُ

আল্লাহ ﷻ এর প্রতি সমস্ত প্রকারের প্রশংসা এবং আল্লাহর রসুল ও তার সাহাবাদের প্রতি সলাত ও সালাম পেশ করার পর কথা হলো, এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য আমার নিজের স্মরনের জন্য শরীয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত ঐ সকল মাসয়ালা মাসায়েল দলিল প্রমাণ সহ একত্রিত করা, যার উপর সকলে একমত হয়েছেন বা দ্বিমত করেছেন। সেই সাথে সংক্ষেপে দ্বিমতের কারন বর্ণনা করা। <[১]> একজন গবেষক

---

<[১]> এই বইটির মূল বৈশিষ্ট এই যে, এটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও এখানে অতি প্রয়োজনিয় মাসয়ালা মাসায়েলগুলো দলীল প্রমান ও আলেমদের মতামতসহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন পাঠক সামান্য পরিশ্রম ব্যায় করেই প্রতিটি মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন। মাসয়ালার কোন বিষয়ে আলেমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কোনটিতে দ্বিমত রয়েছে সে বিষয়ে জানতে পারবেন। উভয় পক্ষের দলীল এবং যক্তি সম্পর্কে অবগত হবেন। এরপর দুটি মতের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পাবেন। বইটির নামের সাথে এই সকল বৈশিষ্টের হুবহু মিল রয়েছে। বইটির নাম বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিয়াহাতুল মুকতাছিদ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) যার সরল অর্থ মুজতাহিদদের জন্য শুরু আর মধ্যম পন্থীদের জন্য শেষ।

(মুজতাহিদ) শরীয়তের সরসরি দলীল প্রমাণ বিদ্যমান নেই এমন যেসব মাসয়ালার মুখমুখী হন এই মাসয়ালা গুলো তার জন্য উৎস ও ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। এই মাসায়ালা সমূহের বেশিরভাগের ব্যাপারে শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে অথবা শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশনার সাথে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে।<[২]> এগুলোর কোনোটিতে আলেমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর কোনোটিতে সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে ব্যাপক ভাবে তাকলীদ <[৩]> ছড়িয়ে পড়ার যুগ পর্যন্ত ফুকাহা এ কিরামের মাঝে

---

অর্থাৎ যারা বিভিন্ন মাসয়ালার উপর চিন্তা গবেষণা করার মাধ্যমে সত্য অবগত হতে চান তাদের জন্য এই বইটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে আর যারা অত বেশি গবেষণা করতে চান না বরং শুধু কোন মাসয়ালাতে কি কি মত বর্ণিত হয়েছে তা জেনে নেওয়াটাই যথেষ্ট মনে করেন তাদের জন্য এই বইই যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

<[২]> অর্থাৎ যেসব মাসয়ালা সম্পর্কে এই বইতে আলোচনা করা হবে তার বেশিরভাগ সম্পর্কে কোরান হাদীসের স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান রয়েছে। যেসব বিষয়ে কোরান হাদীসে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান নেই এমন মাসয়ালা মাসায়েল যতদূল সম্ভব এড়িয়ে চলা হবে যাতে বইয়ের কলেবর অযথা বৃদ্ধি না পায়।

<[৩]> দলীল প্রমানের উপর ব্যাপক চিন্তা গবেষণা না করে আস্থাশীল কোনো আলেমের কথা অনুযায়ী আমল করাকেই তাকলীদ বলা হয়। যারা কোরান হাদীস হতে সরাসরি মাসয়ালা মাসায়ের উদ্ভাবনে সক্ষম নন তারা কোনো আস্থাশীল আলেমের সরনাপন্ন হয়ে তার নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করে আমল করলে সেটা তাকলীদের পর্যায়ে পড়ে। তাকলীদ কখনও প্রশংসিত আবার কখনও নিন্দনীয় হয়। একজন সাধারন মুসলিম কোনো আস্থাশীল আলেমের ফতওয়ার উপর আমল করলে সেটা প্রসংশিত বলে গণ্য হবে উক্ত আলেম ভুল বা সঠিক যাই বলুক তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

{مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ}

যে কেউ জ্ঞান ছাড়া ফতওয়া দেয় তবে যে ফতওয়া দিল পাপের ভার তাকেই বহন করতে হবে। [আবু দাউদ]

## তবে দুটি স্থানে তাকলীদ চরম ঘৃনিত অপরাধ বলে বিবেচিত হবে,

১ . যদি কোনো সাধারন মুসলিম এমন কোনো আলেমের ফতওয়া মেনে চলে যিনি জ্ঞান বা তাকওয়ার

ব্যাপক মতপার্থক্য হয়েছে। <[8]>

.....

وَقَبْلَ ذَلِكَ فَلْنَذْكُرْ كَمْ أَصْنَافُ الطُّرُقِ الَّتِي تُتَلَقَّى مِنْهَا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَكَمْ أَصْنَافُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَكَمْ أَصْنَافُ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَوْجَبَتْ الِاخْتِلَافَ ; بِأَوْجَزِ مَا يُمْكِنُنَا فِي ذَلِكَ، فَنَقُولُ:

إنَّ الطُّرُقَ الَّتِي مِنْهَا تُلُقِّيَتِ الْأَحْكَامُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْجِنْسِ ثَلَاثَةٌ: إمَّا لَفْظٌ، وَإِمَّا فِعْلٌ، وَإِمَّا إقْرَارٌ. وَأَمَّا مَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعُ مِنَ الْأَحْكَامِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إنَّ طَرِيقَ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ هُوَ الْقِيَاسُ.

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: الْقِيَاسُ فِي الشَّرْعِ بَاطِلٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعُ فَلَا حُكْمَ لَهُ وَدَلِيلُ الْعَقْلِ يَشْهَدُ بِثُبُوتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقَائِعَ بَيْنَ أَشْخَاصِ الْأَنَاسِيِّ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ، وَالنُّصُوصَ، وَالْأَفْعَالَ وَالْإِقْرَارَاتِ مُتَنَاهِيَةٌ، وَمُحَالٌ أَنْ يُقَابَلَ مَا لَا يَتَنَاهَى بِمَا يَتَنَاهَى.

**প্রথমেই আমরা শরীয়তের বিধি বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের পন্থা কত প্রকার,**

---

দিক হতে আস্থাশীল নন তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত সাধারন মুসলিম অপরাধী সাব্যস্ত হবে। একজন মুসলিমের উপর দায়িত্ব হলো নিজের দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে এমন কারো নিকট সরানপন্ন হওয়া যিনি জ্ঞান ও তাকওয়ার মানদণ্ডে উত্তির্ণ। যে সকল আলেম ওলামারা রাজা বাদশাদের দরবারে যাওয়া আসা করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ফতওয়া দিয়ে থাকে তাদের ফতওয়া অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে না। একজন মুসলিম কেবল ঐ সকল আলেমের ফতওয়া মেনে চলবে যারা শুধু আল্লাহকেই ভয় করে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

২. যে ব্যাক্তিকে আল্লাহ কোরান হাদীস বুঝা ও দ্বীনের গভীর বিষয় সমূহ অনুধাবন করার শক্তি দিয়েছেন যদি এই ব্যাক্তি সত্য অনুধাবনের পরও তার বিপরীতে কোনো একজন বড় আলেম বা মুজতাহিদের কথা মেনে চলে তবে এটা মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١]

তারা তাদের আলেম ও সন্যাসীদের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে [সূরা তাওবা/৩১]

<[8]> এক কথায় এসব ব্যাপারে সর্বযুগেই মতপার্থক্য ছিল।

শরয়ী বিধান কত প্রকার, যে সকল কারণে মতপার্থক্য হয় তা কত প্রকার ইত্যাদি সম্পর্কে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা সেরে নেবো। <[৫]>

---

<[৫]> এই সম্পর্কিত জ্ঞানকে উসুলে ফিকহ (اصول الفقه) বলা হয়। প্রতিটি মাযহাবের বরেণ্য আলেমগণ এই বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। হানাফী মাযহাবের আলেমদের নিকট, বাযদাবী, কারখী, উসুলে শাশী, নুরুল আনওয়ার ইত্যাদি গ্রন্থ সুপরিচিত। মালেকী মাযহাবের আলেম কাজী ইবনে আরবীর আল মাহ'সুল ফিল উসুল (المحصول في الاصول) বইটিও এই বিষয়ের উপরই লেখা। ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমেই উসুলে ফিকহের উপর বুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যকিয়। উসুলে ফিকার বিবিধ প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। যেমন,

ক . কোরান ও হাদীসের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা।

খ . মুজাতাহিদ ইমামগণ যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন তার কারণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

গ . যে সব বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন সেসব বিষয়ে সঠিক মত কোনটি তা নির্ণয় করা।

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটি সহজে বোঝানোর চেষ্টা করছি,

**ক . কোরান ও হাদীসের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা।**

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: ৯৩]

যে কেউ কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম সে চিরোকাল সেখানে অবস্থান করবে। [ সূরা নিসা/৯৩]

এই আয়াতের চিরকাল অবস্থান করবে এই অংশটুকু হতে অনেকে মনে করতে পারে যে ব্যাক্তি কোনো মুমিনকে হত্যা করবে সে একজন কাফিরের মতই চিরকাল জাহান্নামী হবে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়ার সমস্ত আলেমদের নিকট এই আয়াতটির অর্থ এমন নয় বরং এখানে চিরকাল বলতে বহুদিন বোঝানো হয়েছে। উসুলে ফিকাহর পরিভাষায় এখানে খুলুদ (خلود) শব্দটির প্রকৃত অর্থ বা হাকীকত (حقيقة) উদ্দেশ্য নয় বরং এর রুপক অর্থ বা মাজাঝ (مجاز) উদ্দেশ্য।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ১৮৭]

তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা সুতা কালো সুতা হতে পৃথক হয়ে যায়। [ সূরা বাকারা/১৮৭]

এই আয়াত সেহরী খাওয়ার সময় সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। অনেক সাহাবা ﷺ এই আয়াতে সুতা বলতে প্রকৃত সুতা মনে করে নিজেদের বালিশের নিচে সাদা ও কালো দুটি সুতা রেখে লক্ষ করতেন কখন সাদা সুতাটি কালোটি হতে পৃথক করা যায় ফলে তারা অধিক সময় ধরে সেহরী খেতেন। পরে আল্লাহর রসুল ﷺ এর নিকট বিষয়টি জানালে তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে এখানে সুতা বলতে আকাশের সাদা ও কালো রেখাকে বোঝানো হয়েছে প্রকৃত সাদা সুতা ও কালো সুতা নয়। সম্পূর্ণ কাহিনীটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে।

এটা শুধু একটি বিষয় মাত্র। এমন বহু বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকলে কোরান ও হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়।

ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে একটি হলো নাসিখ ও মানসুখ (الناسخ والمنسوخ)। কোরানের এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কোরানের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে তার তিলাওয়াত করলে সওয়াব হবে সেগুলোর মাধ্যমে সলাত পড়াও বৈধ হবে কিন্তু তার উপর আমল করা যাবে না এই সকল আয়াতকে মানসুখ বা রহিত বলা হয়,

আল্লাহ বলেন,

{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: ١٠٦]

আমি যে আয়াতই রহিত করি বা তুলে নিই সেটার পরিবর্তে তদাপেক্ষা উত্তম বা তার সমপর্যায়ের অন্য একটি আয়াত আনয়ন করি। [ সূরা বাকারা/১০৬]

{ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} [النحل: ١٠١]

যখন আমি একটি আয়াতের পরিবর্তে সেই স্থানে অন্য একটি আয়াত আনয়ন করি, আর আল্লাহই ভাল জানেন তিনি কি নাযিল করছেন..... [সূরা নাহল/১০১]

একই ভাবে আল্লাহর রসুল ﷺ এর বহু সংখক হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যাবে যা অন্য হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কোরানের কোন আয়াত বা আল্লাহর রসুল ﷺ এর কোন হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে এই বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান যাদের নেই তারা কখনই ইসলামের সঠিক মমার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।

একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ১৮০]

তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের মৃত্যু হাজির হলে পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ওসিয়ত করা ফরজ করা হয়েছে। [ বাকারা/১৮০]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে পিতামাতার জন্য ওসিয়ত করতে বলা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন কেউ মারা গেলে পিতা মাতা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে সে কারণে তাদের জন্য মৃত্যুর আগে ওসীয়ত করা বৈধ নয়। কেউ বলেছেন এই আয়াতটি সূরা নিসার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে অন্য একদল আলেম বলেছেন বরং এটাকে রহিত করেছে আল্লাহর রসুল ﷺ এর বাণী,

{إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ}

নিশ্চয় আল্লাহ যার যা পাওনা তা দিয়ে দিয়েছেন অতএব এখন আর কোনো উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়ত করা যাবে না। [ আবু দাউদ]

হাদীসের মাধ্যমে কোরানের আয়াত মানসুখ হতে পারে কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে কিছু দ্বিমত আছে কিন্তু কোরআন বা হাদীসের কিছু অংশ যে মানসুখ বা রহিত সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং যারা এই সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান রাখে না তাদের জন্য শরীয়তের বহু বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া সম্ভব হবে না।

হযরত আলী ﷺ একবার কোনো একজন কাজীকে বললেন,

أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت

তুমি কি কোনটি নাসেখ মানসুখ তা জানো। সে বলল, না আলী ﷺ বললেন তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছো অন্যকেও ধ্বংস করেছো। [আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন]

একইভাবে কিছু বিষয় রয়েছে যেটা সাধারনভাবে বলা হয় কিন্তু সব স্থানে তা প্রয়োগ হয় না। যেমন আল্লাহ বলেন, জিনা কারী পূরুষ বা মেয়েকে ১০০ বার বেত্রাঘাত করতে কিন্তু এই আয়াতের বিধান বিবাহিত জিনাকারীর ক্ষেত্রে পযোজ্য নয় বরং বিবাহিতের ক্ষেত্রে বিধান হলো রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা। এটা কোরানের কোনো আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত। আল্লাহ চোরের হাত কেটে ফেলতে বলেছেন কোরানের আয়াতে সাধারনভাবে চোর শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে কিন্তু হাদীসে বলা হয়েছে এক দিনারের চারভাগের একভাগ পরিমান বা তার বেশি চুরি করলে তার হাত কাটা হবে অর্থাৎ এর কম চুরি করলে তার হাত কাটা হবে না। [সহীহ বুখারী ও

মুসলিম]

এছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে। উসুলে ফিকাহ এই সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে থাকে। সামনে সেসব বিষয়ে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ।

**খ. আলেমদের মাঝে মতপার্থক্যের কারণ জানা।**

অল্প জ্ঞান সম্পন্ন অনেক লোক আছে যারা বলে থাকে কোরান ও হাদীস একই হওয়া সত্তেও মুজতাহিদ আলেমগণ বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত কেনো করেছেন? তারা কেউ কেউ এ কারণে বরেণ্য মুজতাহিদ ইমামদের তিরষ্কারও করে থাকে (নাউযু বিল্লাহ)। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া # পৃথক একটি বই রচনা করেছেন যার নাম (رفع الملام عن الائمة الاعلام) অর্থাৎ বরেণ্য আলেমদের প্রতি অভিযোগের জবাব। সেখানে তিনি মতপার্থক্যের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেন,

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ .

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة

মতপার্থকের গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহ তিন প্রকার।

(১) তিনি হয়তো মনেই করেন না যে রসুলূল্লাহ ﷺ এমনটি বলেছেন।

(২) রসুলুল্লাহ ﷺ এর কথার যে এমন অর্থ হতে পারে তা তিনি মনে করেন না।

(৩) তিনি হয়তো মনে করেন যে উক্ত বিধানটি মানসুখ হয়ে গেছে।

এই তিনটি প্রকার আবার বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়।

এরপর তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন। তার কথার মধ্যে তিনি বলেন,

السبب الأول : ألا يكون الحديث قد بلغه

প্রথম কারণঃ এমন হতে পারে যে হাদীসটি তার নিকট পৌছায়নি।

তিনি আরো বলেন,

وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث

পূর্ববর্তীদের যেসব কথা হাদীসের বিরুদ্ধে দেখা যায় তার বেশিরভাগের কারণ এটাই।

অর্থাৎ কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের মত হাদীসের বিরুদ্ধে যাওয়ার মূল ও প্রধান কারণ হাদীসটি সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকা। লক্ষনীয় হলো তিনি এটিকে প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন একমাত্র কারণ হিসাবে নয়। এর অর্থ হলো এমনও হতে পারে যে কোনো হাদীস সম্পর্কে জানা থাকা সত্তেও দুজন মুজতাহিদ ইমামের মাঝে দ্বিমত হয়েছে। তিনি সপ্তম নম্বর কারণে এ বিষয়ে আলোচনা করে বলেন,

السبب السابع : اعتقاده أن لا دلالة في الحديث

সপ্তম কারণঃ তিনি এমন মনে করতে পারেন যে উক্ত হাদীসে ঐ বিষয়ে কোনো দলীল উপস্থিত নেই।

অর্থাৎ একই হাদীস একজন মুজতাহিদ যে বিষয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণ করছেন অন্যজন তাতে দলীল হিসাবে মনে নাও করতে পারেন।

এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন,

بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ .مثل: أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب، أو لا يقتضي الفور أو أن المعرف باللام لا عموم له أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها أو أن المقتضي لا عموم له، فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني.إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه

এমন হতে পারে যে তার নিকট এমন কিছু মূল নীতি রয়েছে যা উক্ত হাদীসের দলীলকে অগ্রহনযোগ্য সাব্যস্ত করে তার সেই মূলনীতি সঠিক বা ভুল যাই হোক। যেমন হয়তো তিনি মনে করেন যে আম পরে খাস হয়ে গেলে তা দলীল হিসাবে গ্রহনযোগ্য নয় বা মাফহুম দলীল নয়। অথবা যে আম কোনো কারণে বর্ণিত হয়েছে সেটি উক্ত কারণের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকবে। ..... এমন আরো অনেক বিষয় যা এক্ষেত্রে বলা যায়।

মোট কথা উসুলের পরিভাষার মাধ্যমে আলেমদের মতপার্থক্যকে ব্যাখ্যা করা যায়। যাদের উসুলে ফিকাহ সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারা হাদীস পৌছানোর পরও কিভাবে দুজন বরেণ্য আলেমের মাঝে মতপার্থক্য হতে পারে তা বুঝতে সক্ষম হবে না।

এখানে একটি উহাদরণ দেওয়া যেতে পারে। রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

যে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার সলাত হবে না।[সহীহ বুখারী]

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ এর মতে সূরা ফাতিহা সলাতের রুকুন সমূহের একটি। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বা ভুলে সূরা ফাতিহা না পড়ে তবে তার সলাত আদায় হবে না। তাদের দলীল এই হাদীসটি। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা এর মতে সলাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, এটা সলাতের রুকুন নয়। যদি কেউ এটা পড়তে ভুলে যায় তবে তার সলাত আদায় হয়ে যাবে সলাতের ভিতর মনে পড়লে তাকে সাহু সাজদা করতে হবে।

অনেকেই মনে করবেন ইমাম আবু হানীফা এই হাদীসটির বিরুদ্ধে গেছেন। তবে প্রকৃত ঘটনা তা নয় বরং ইমাম আবু হানীফা # এই হাদীস হতে সলাত হবে না বলতে সলাত পূর্ণ হবে না এমন বুঝেছেন। তার এই ব্যাখ্যা কেউ গ্রহণ না করলে দোষ নেই তবে এই বিষয়ে কেউ তার নিন্দা করলে সেটা মারাত্মক অপরাধ হবে। কারণ উসুলের পরিভাষায় এই ধরণের ব্যাখ্যার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

একইভাবে রসুলূল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فمن تركها فقد كفر

যে কেউ সলাত পরিত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যায়। [তিরমিযী]

কেবল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ছাড়া অন্য সকল ইমামের মতে এখানে প্রকৃত কুফরী উদ্দেশ্য নয় বরং ছোট কুফর উদ্দেশ্য। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে কেউ সলাত পরিত্যাগ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এখানে এমন বলা যাবে না যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ছাড়া অন্যরা এই হাদীস অমান্য করার কারণে পাপী হয়েছেন। কারণ এখানে কুফরীকে তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ না করাটা উসুল সম্মত।

এভাবে বিভিন্ন মাসয়ালাতে আলেমদের মাঝে যে মতভেদ হয়েছে তার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে তারা যথার্থর্ কারণেই মতপার্থক্য করেছেন স্বেচ্ছায় হাদীসের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন এমন নয়। এতদূর জ্ঞান অর্জন করলে আল্লাহর রসুলের এই কথার মমার্থ বুঝে আসবে,

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

যখন বিচারক চিন্তা গবেষণা করে রায় দেন আর তার রায় সঠিক হয় তখন তার দুটি সওয়াব দেওয়া হয় আর যখণ চিন্তা গবেষণা করে রায় দেন আর তার রায় ভুল হয় তখন একটি সওয়াব দেওয়া হয়। [সহীহ বুখারী]

গ . যে সব বিষয়ে ইমাম মুজতাহিদরা মতপার্থক্য করেছে সেসব বিষয়ের সব গুলো মতের উপর

আমরা বলবো, আল্লাহর রসুলﷺএর নিকট হতে শরীয়তের বিধিবিধান সমূহ তিনটি পদ্ধতিতে অর্জিত হয়েছে, (১) কথার মাধ্যমে (২) কাজের মাধ্যমে (৩) সম্মতি প্রদানে মাধ্যমে। <[৬]> আর যে সব বিষয়ে সরাসরি শরীয়তের কোনো বিধান নেই বেশিরভাগ আলেম বলেছেন সেগুলোর বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার উপায় হলো কিয়াস। <[৭]>

তবে আহলে জাহের <[৮]> বলেছে শরীয়তে কিয়াসের কোনো অস্তিত্ব নেই, যেসব বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনা নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে কোনো বিধান নেই। তবে চিন্তা ভাবনা করলে কিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির মানুষের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে তা অসীম অথচ আল্লাহর রসুলের স্পষ্ট কথা, কাজ ও সম্মতি (এক কথায় শরীয়তের দলীল) সিমীত। যা সীমিত তার মাধ্যমে অসীমের মুকাবিলা করা অসম্ভব। <[৯]>

---

একত্রে আমল করা সম্ভব নয় বরং আমাদের অবশ্যই একটি মত বাছায় করতে হবে। নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী একটি মত বাছায় করে নিলেই আল্লাহর দরবারে মুক্তি পাওয়া যাবে না। ঐ সকল মতের মধ্যে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য এটা জানার জন্যও উসুলে ফিকাহর উপর জ্ঞান অর্জন জরুরী।

<[৬]> আল্লাহর রসুল মুখে কিছু বলেছেন বা কোনো কাজ করেছেন বা কোনো কাজ কাউকে করতে দেখেছেন কিন্তু নিশেধ করেন নি এই বিষয়গুলোকেই যথাক্রমে কওলী, ফি'লী, ও তাকরীরী হাদীস বলা হয়। আল্লাহর রসুলের নিকট হতে শরীয়তের যা কিছু বিধিবিধান পাওয়া গেছে তা এই তিন প্রকারের বাইরে নয়। এখানে কোরআনকে প্রথম প্রকারের মধ্যে ধরা যায় যেহেতু এটা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে আল্লাহর রসুলের মুখ দ্বারা নিঃসরিত হয়েছে।

<[৭]> কিয়াস অর্থ হলো পরিমাপ করা বা অনুমান করা। যেসব বিষয়ে সরাসরি কোনো বিধান নেই অন্যান্য বিধানের উপর চিন্তা গবেষণা করে সে ব্যাপারে রায় দেওয়কে কিয়াস বলা হয়।

<[৮]> ইবনে হিযাম, দাউদ আজ-জাহেরী ইত্যাদি আলেমগন ও তাদের অনুসারীদের আহলে জাহির বলা হয়ে থাকে। তাদের মূল বৈশিষ্ট হলো কোনোরুপ জটিলতা ছাড়ায় কোরআন ও হাদীসের আদেশ নিষেধ গুলো সরাসরি অনুরণ করা।

<[৯]> এই বিষয়টি আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীস হতেও অনুধাবন করা যায়। রসুলুল্লাহ ﷺ মুয়াজ ইবনে জাবাল ﷺ কে ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় বললেন, তুমি কিভাবে বিচার ফয়সালা করবে?

وَأَصْنَافُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُتَلَقَّى مِنْهَا الْأَحْكَامُ مِنَ السَّمْعِ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَرَابِعٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. أَمَّا الثَّلَاثَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: فَلَفْظٌ عَامٌّ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ، أَوْ خَاصٌّ يُحْمَلُ عَلَى خُصُوصِهِ، أَوْ لَفْظٌ عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ، أَوْ لَفْظٌ خَاصٌّ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، وَفِي هَذَا يَدْخُلُ التَّنْبِيهُ بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، وَبِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى، وَبِالْمُسَاوِي عَلَى الْمُسَاوِي

যে সকল মৌখিক কথার <[১০]> মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধান অবগত হওয়া যায় সেগুলো চার প্রকার। তিনটির ব্যাপারে সকলে একমত আর একটির ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। যে তিনটির ব্যাপারে সকলে একমত সেগুলো হলো

১ . কোনো কিছু আমভাবে বলা এবং আম অর্থই উদ্দেশ্য করা বা খাসভাবে বলা আর খাস অর্থই উদ্দেশ্য করা।

---

তিনি বললেন আল্লাহর কিতাব দ্বারা। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? তিনি বললেন তবে আল্লাহর রসুলের সুন্নাত দ্বারা। রসুলূল্লাহ ﷺ বললেন, যদি আল্লাহর রসুলের ্সুন্নাতেও না পাও? তিনি বললেন, তবে আমি আমার বুদ্ধি বিবেক দ্বারা সাধ্যমত চেষ্টা করবো আর সামান্যও ত্রুটি করবো না। রসুলূল্লাহ ﷺ খুশি হয়ে বললেন,

{الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله}

আল্লাহর প্রশংশা যিনি তার রসুলের দূতকে এমন কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন যারা মাধ্যমে তার রসুল সন্তুষ্ট হয়েছেন। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

এই হাদীস প্রমাণ যে কোরান বা হাদীসে সরাসরি যেসব বিধান বর্ণিত আছে তার মাধ্যমে সকল বিষয়ে রায় দেওয়া সম্ভব হবে না। বরং কখনও কখনও কোরান ও হাদীসে যা কিছু বর্ণিত আছে তার উপর চিন্তা গবেষণা করে বা তার সাথে কিয়াস করে কোনো বিষয়ের রায় দেওয়ার প্রয়োজনিয়তা দেখা দেবে।

<[১০]> উপরে আলোচনা হয়েছে যে শরীয়তের বিধিবিধান আল্লাহর রসুল ﷺ হতে তিনভাবে অবগত হওয়া যায় (১) তার কথার মাধ্যমে (২) কাজের মাধ্যমে (৩) সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে। এখানে প্রথম প্রকারটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। এই আলোচনার একেবারে শেষের দিকে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কেও আলোনা হবে।

২ . কোনো কিছু আমভাবে বলা কিন্তু খাস অর্থ উদ্দেশ্য করা (অর্থাৎ সর্ব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য না হওয়া)।

৩ . কোনো কিছু খাসভাবে বলা কিন্তু আম (ব্যাপক অর্থ) উদ্দেশ্য হওয়া। <[১১]>

---

<[১১]> এখানে আম ও খাস শব্দ দুটির অর্থ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়া দরকার আম বলতে বোঝায় ব্যপক অর্থ বোধক শব্দ যেমন "ফেরেস্তারা নুরের তৈরী" এই বাক্যে "ফেরেস্তা" শব্দটি আমভাবে সকল ফেরেস্তার উপর প্রযোজ্য হয়। আর খাস বলতে বোঝায় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে ব্যাবহৃত শব্দ। যেমন "যায়েদ ভাল ছেলে" কথাটিতে নির্দিষ্ট করে যায়েদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, সে ভাল ছেলে এই কথা অন্য কারো ব্যাপারে প্রযোজন্য নয়। অর্থাৎ "ফেরেস্তা" শব্দটি আম আর "যায়েদ" শব্দটি খাস। শব্দের অর্থগত ব্যাপকতাকে উমুম (عموم) এবং কোনো শব্দ নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুর উপর ব্যাবহার হওয়াকে খুসুস (خصوص) বলা হয়। আমরা বলতে পারি "ফেরেস্তা" শব্দটির মধ্যে উমুম রয়েছে আর "যায়েদ" শব্দটির মধ্যে খুসুস রয়েছে। এই কথাটিই অন্যভাবে বলা হয় "ফেরেস্তা" শব্দটি আম আর "যায়েদ" শব্দটি খাস।

## * প্রতিটি শব্দের উমুম (عموم) ও খুসুস (خصوص) রয়েছে।

আমরা উপরে বলেছি "ফেরেস্তা" শব্দটি আম আর "যায়েদ" শব্দটি খাস। যেহেতু "ফেরেস্তা" শব্দটি আমভাবে সকল ফেরেস্তার উপর প্রযোজ্য হয় আর "যায়েদ" শব্দটি বিশেষভাবে যায়েদ নামের একজনের উপর প্রযোজ্য হয়। উপরের একই উদাহরণে আমরা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারি। ফেরেস্তারা নুরের তৈরী এই কথাটির মাধ্যমে বিশেষভাবে ফেরেস্তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে তারা নুরের তৈরী অন্য কাউকে নয়। এই দৃষ্টিকোন থেকে ফেরেস্তা শব্দটি খাস। সুতরাং এক দিক থেকে ফেরেস্তা শব্দটি আম অন্য দিক থেকে এটা খাস। আবার যদি বলা হয় যায়েদকে প্রহার করো তাহলে যায়েদের শরীরের যে কোনো স্থানে প্রহার করলেই উক্ত হুকুম পালন করা হয়েছে প্রমাণিত হবে। তাহলে "যায়েদ" শব্দটির মাধ্যমে তার হাত, পা, চোখ শরীর ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বোঝায় সুতরাং যায়েদ শব্দটির মধ্যেও অর্থগত ব্যাপকতা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যায়েদ শব্দটি এক দিক থেকে খাস যেহেতু এটা যায়েদ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝায় না আবার অন্য দিক হতে আম যেহেতু এটা যায়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গকে শামিল করে। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রতিটি শব্দই একদিক হতে আম অন্য দিক হতে খাস। অর্থাৎ উমুম ও খুসুস এমন দুটি গুন যা প্রতিটি শব্দের মধ্যেই রয়েছে।

এখন আমরা লেখক কর্তৃক উল্লেখিত তিনটি পয়েন্টের দিকে ফিরে যাবো। তিনি প্রথমেই বলেছেন,

কোনো কিছু আমভাবে বলা এবং আম অর্থই উদ্দেশ্য করা বা খাসভাবে বলা আর খাস অর্থই উদ্দেশ্য করা।

এখানে তিনি দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমত কোনো কিছু আম ভাবে বলা এবং আমই উদ্দেশ্য করা আর দ্বিতিয়ত কোনো কিছু খাস ভাবে বলা এবং খাসই উদ্দেশ্য করা।

প্রথমটির উদাহরন বিরল। কারণ আলেমদের কথা হলো,

ما من عام إلا وقد خص

এমন কোনো আম নেই যা খাস হয়ে যায় নি। [আল ইতকান]

আল্লাহ সাধারনভাবে সকল মুমিনদের সলাত আদায় করতে বলেছেন কিন্তু এই বিধানের মধ্যে পাগল, নাবালেগ, হায়েজগ্রস্থ মহিলা ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা অন্তর্ভূক্ত হবে না। এভাবে সূরা মায়েদাতে চোরের হাত কাটার আদেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু হাদীস হতে জানা যায় যে, চোর এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগের কম চুরি করে তার ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়, দুর্ভিক্ষের সময় এই বিধান প্রযোজ্য নয় ইত্যাদি। সূরা নুরে জিনাকারীকে ১০০ বেত্রাঘাত করতে বলা হয়েছে হাদীস হতে জানা যায় এই বিধান বিবাহিত জেনাকারীর জন্য প্রযোজ্য নয় বরং তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এভাবে সকল বিধানের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু ব্যাতিক্রম রয়েছে। জালালুদ্দিন সুয়ুতী বলেন,

الوقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله حرمت عليكم أمهاتكم . . الآية فإنه لا خصوص فيها

আমি অনেক চিন্তা গবেষণার পর একটি আয়াত খুজে পেয়েছি যেটা কোনোভাবেই খাস হয়ে যায় নি। সেটা হলো আল্লাহর কথা,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ২৩]

তোমাদের উপর তোমাদের জননীদের বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। [নিসা/২৩]

## * খাস ভাবে বলা হয়েছে এবং খাসই উদ্দেশ্য করা হয়েছে এমন উদাহরণ প্রচুর।

প্রায় প্রতিটি আয়াতই এর উদাহরণ। আল্লাহ চোরের হাত কাটতে বলেছেন এই হাত আয়াত হতে শুধু চোরের ব্যাপারে হাত কাটার শাস্তি প্রমাণিত হয় অন্য কারো ব্যাপারে নয়। এভাবে দু একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি বিধানই খাসভাবে বলা হয়েছে এবং খাসের উপরই বহাল আছে।

শেষের প্রকারের মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তভূক্ত হয়। (১) অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে অপেক্ষকৃত কম গুরত্বের অদিকারী বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা (২) কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে অধিক গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা (৩) একই

---

লেখক দ্বিতিয় প্রকারে বলেছেন,

কোনো কিছু আমভাবে বলা কিন্তু খাস অর্থ উদ্দেশ্য করা অর্থাৎ সর্ব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য না হওয়া। আমরা আগেই বলেছি প্রায় প্রতিটি বিধানই এই পর্যায়ে পড়ে। কারণ আলেমরা বলেছেণ এমন কোনো আম নেই যা খাস হয়ে যায় নি। এর উদাহরণও আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

লেখকের উল্লেখিত তিন নং বিষয়টি হলো,

কোনো কিছু খাসভাবে বলা কিন্তু আম (ব্যাপক অর্থ) উদ্দেশ্য হওয়া। এই প্রকারের উদাহরণ অপেক্ষাকৃত কম হলেও একেবারে বিরল নয়। আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: ٣٣]

তোমাদের দাসীরা যদি পবিত্র থাকতে চাই তবে তাদের জিনা করতে বাধ্য করো না [নুর/৩৩]

আয়াতে বলা হয়েছে যদি তারা জিনা করতে না চাই তবে বাধ্য করা যাবে না অর্থাৎ খাসভাবে যখন দাসীরা আপত্তি করে তখন তাদের দ্বারা জিনা না করানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো দাসীরা যদি স্বেচ্ছাও জিনা করতে চায় তবু তাদের দ্বারা তা করানো যাবে না।

অন্য একটি আয়াতে কোন কোন মেয়েকে বিবাহ করা হারাম সে প্রসঙ্গে এসেছে,

{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣]

আর তোমাদের স্ত্রীদের ঐ সকল মেয়েরা যারা তোমাদের কোলে পালিত হয়। [নিসা/২৩]

এই আয়াতে বিশেষভাবে স্ত্রীর অন্য পক্ষের যেসব মেয়েরা পরবর্তী স্বামীর কোলে পালিত হয় তাদের হারাম বলা হচ্ছে। এ থেকে কোনো কোনো আলেম বলেছেন স্ত্রীর অন্য পক্ষের যে সব মেয়েরা পরবর্তী স্বামীর গৃহে পালিত হয় না বরং দূরে পালিত হয় উক্ত স্বামীর জন্য ঐ মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ। কিন্তু জমহুর আলেমের মতে আয়াতে যদিও খাসভাবে শুধু কোলে পালিত মেয়েদের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এখানে আমভাবে স্ত্রীর সকল মেয়েদের হারাম করা উদ্দেশ্য।

রকম দুটি বিষয়ের একটির মাধ্যমে অন্যটির দিকে ইঙ্গিত করা। <[১২]>

---

<[১২]> উপরে আমরা বলেছি যে, কখনও কখনও খাস এর মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ বিশেষভাবে কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো কথা বলা হয় কিন্তু যে বস্তু বা বিষয়ে কথা বলা হলো তার বাইরের অনেক কিছু উক্ত বিধানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। এ বিষয়টির উদাহরণও পূর্বে গত হয়েছে। এখন লেখক আলোচনা করছেন কিভাবে খাসের মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য হয় সে সম্পর্কে। তিনি তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন,

ক . অধিক গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } [الأحزاب: ٣٢]

ওহে নবীর স্ত্রীগণ তোমরা তো অন্য মেয়েদের মতো নও। অতএব তোমরা নরম সূরে কথা বলো না তাহলে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কুচিন্তা করার সুযোগ পাবে আর তোমরা উত্তম কথা বলো [ সূরা আহযাব/৩২ ]

এখানে নবীদের স্ত্রীদের খাসভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অথচ সকল নারীদের ক্ষেত্রে এই একই বিধান। আসলে এখানে বোঝানো হচ্ছে যদি নবীর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এই বিধান হয় তবে অন্য মেয়েদের অবস্থা কি হতে পারে। এটাকেই বলা হয় অধিক গরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তার নবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥]

যদি আপনি শিরক করেন তাহলে আপনার আমল বিনষ্ট হবে। [ঝুমার/৬৫]

এই আয়াতে শিরকের ভয়াবহতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে এমন কি আল্লাহর রসুলও যদি শিরক করতেন তবে তার সকল আমল বিনষ্ট হতো যাতে এ থেখে অন্যরা বুঝে নেই শিরক করলে তাদের অবস্থা কি হবে। অর্থাৎ এখানেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

খ . কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَمِثَالُ الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ৩] فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْخِنْزِيرِ مُتَنَاوِلٌ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْخَنَازِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ يُقَالُ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِالِاشْتِرَاكِ، مِثْلَ خِنْزِيرِ الْمَاءِ. وَمِثَالُ الْعَامِّ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ: قَوْله تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ১০৩] ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَيْسَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْمَالِ. وَمِثَالُ الْخَاصِّ يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ: قَوْله تَعَالَى

---

{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ২৩]

তোমরা পিতামাতার উদ্দেশ্যে উফ শব্দ বলো না। [ইসরা/২৩]

এখানে উফ শব্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে এর মাধ্যমে পিতা মাতাকে গালি দেওয়া বা প্রহার করার ব্যাপারটি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও প্রমানিত। এটা ছোট বিষয়ের মাধ্যমে বড় বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করার দৃষ্টান্ত।

গ . সম স্তরের দুটি বিষয়ের একটির মাধ্যমে অন্যটিকে অন্তভূর্ক্ত করা। মালিক ইবনে হুয়অইরিস ও তার একজন সাথী ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বের হলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন,

أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما

তোমরা আযান ও ইকামত দেবে আর তোমাদের মধ্যে যে বয়ষে বড় সে ইমাম হয়ে সলাত আদায় করবে [সহীহ বুখারী]

আল্লাহর রসুলের এই আদেশ যদিও খাসভাবে এই দুজন সাহাবার উদ্দেশ্যে এসেছে কিন্তু এর মাধ্যমে আলেমগণ সফরে গেলে বা একাকী সলাত আদায় করলে আযান ও ইকামত সহ সালাত আদায় করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে দুজন ব্যাক্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া নির্দেশকে সকল মুসল্লীর (নামাযী) জন্য সমানভাবে কার্যকর মনে করা হচ্ছে। কারণ আযাণ ও ইকামতের ক্ষেত্রে সকল মুসল্লীই সমান।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিওয়া উচিত। আলেমদের নিকট গৃহিত নীতি হলো খাস আমের তুলনায় শক্তিশালী। যদি কোনো কিছু কোথাও আমভাবে বলা হয় আর অন্য স্থানে খাসভাবে বলা হয় তবে খাসই প্রাধান্য পাবে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন জেনাকারীকে বেত্রাঘাত করতে। জেনাকারী শব্দটি আমভবে সকল জিনাকারীকে বোঝায়। সে হিসাবে সকল জিনাকারীকে বেত্রাঘাত করার বিধান হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হাদীসে এসেছে জেনাকারী বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এখানে অল্প জ্ঞানের অধিকারী কেউ মনে করতে পারে যে, কোরআন ও হাদীসের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো আম ও খাসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বরং খাসের অর্থটি আমের জন্য ব্যাখ্যা সরুপ।

{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ২৩] ، وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى، فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمُ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ،

প্রথমটির <[১৩]> উদহারণ হলো আল্লাহর বাণী,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ৩]

তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত ও শুকরের মাংস হারাম করা হয়েছে। [সূরা মায়েদা/৩] <[১৪]>

কেননা সকল মুসলিম একমত যে এখানে শুকর বলতে সকল প্রকারের শুকর বোঝানো হয়েছে। <[১৫]> যতক্ষণ না কোনো কিছুকে শুকর বলা হবে ইশতিরাক

---

<[১৩]> প্রথমটির বলতে উপরে তিনটি পয়েন্টের প্রথমটি অর্থাৎ ‘‘কোনো কিছু আমভাবে বলা এবং আম অর্থই উদ্দেশ্য করা বা খাসভাবে বলা আর খাস অর্থই উদ্দেশ্য করা।’’

<[১৪]> এই উদাহরণটি প্রথম পয়েন্টের প্রথম অংশের উদাহরণ অর্থাৎ কোনো কিছু আমভাবে বলা এবং আম অর্থই উদ্দেশ্য করা। দ্বিতীয় অংশ তথা ‘‘কোনো কিছু খাসভাবে বলা এবং খাস অর্থই উদ্দেশ্য করা’’ এর কোনো উদাহরণ লেখক উল্লেখ করেন নি কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি কোরআনে এই প্রকৃতির উদাহরণ প্রচুর। কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি আয়াতই এই প্রকারের উদাহরণ। যেমন আল্লাহ জিনাকারীকে বেত্রাঘাত করতে আদেশ করেছেন এই আয়াত হতে জিনাকারী ছাড়া অন্য কাউকে বেত্রাঘাত করার বিধান প্রমাণিত হয় না সুতরাং আয়াতটি খাস অর্থের উপর বহাল রয়েছে।

<[১৫]> উল্লেখিত আয়াতটিকে লেখক ‘‘কোনো কিছু আমভাবে বলা এবং আম অর্থ উদ্দেশ্য করা’’ এর ব্যাপারে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু এখাতে শুকর বলতে সকল প্রকারের শুকর বোঝানো হয়েছে। আমরা পূর্বে সূয়ুতীর একটি কথা উল্লেখ করেছি যে, এমন কোনো আম নেই যা কোনো না কোনো ভাবে খাস হয়ে যায় নি। তিনি আরো বলেন,

আমি অনেক চিন্তা গবেষণার পর একটি আয়াত খুজে পেয়েছি যেটা কোনোভাবেই খাস হয়ে যায় নি। সেটা হলো আল্লাহর কথা,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ২৩]

তোমাদের উপর তোমাদের জননীদের বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। [নিসা/২৩]

(اشتراك) বা দ্বৈত অর্থে যেমন পানির শুকর (خنزير الماء)। <[১৬]>

---

বোঝা যাচ্ছে লেখকের উল্লেখিত আয়াতটিকে তিনি এই পর্যায়ের বলে মনে করেন নি। প্রকৃত ব্যাপার হলো লেখকের উল্লেখিত আয়াতটিও অন্য আয়াত দ্বারা খাস হয়ে গেছে যেখানে বলা হয়েছে বাধ্য হলে শুকরের মাংস খাওয়া যায়। সুতরাং সুয়ুতীর উল্লেখিত আয়াতটিই এবিষয়ে উপযুক্ত উদাহরণ। তবে লেখক এখানে শুধু শুকর শব্দের দিকে লক্ষ করে আয়াতটিকে আমের উপর বহাল মনে করেছেন। এটা তার কথা হতেও স্পষ্ট। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে আয়াতটিকে আমের উপর বহাল মনে করা যথাপযুক্ত। কারণ শুকরের মাংস হারাম বলতে - কোনো ব্যাতিক্রম ছাড়াই - সকল প্রকার শুকরকেই বোঝানো হয়েছে।

<[১৬]> এখানে লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। শুকরের মত দেখতে পানিতে বাস করে এমন একপ্রকার প্রাণীকে আরবীতে খিনযিরুল মা (خنزير الماء) বা পানির শুকর বলা হয়। যে আয়াতে শুকরের মাংস হারাম বলা হয়েছে সেখানে শুকরের অর্থের মধ্যে পানির শুকর অন্তর্ভূক্ত হবে না যদিও সেটির নামের সাথে শুকর যুক্ত রয়েছে। কারণ শুকর নামটি পানির শুকরের উপর প্রজেয্য হওয়াটি উমুম (عموم) বা ব্যাপক অর্থের উপর নির্ভর করে নয় বরং ইশতিরাক (اشتراك) বা দ্বৈত অর্থের উপর নির্ভর করে। যেমন বাংলাতে তীর শব্দটি ধনুকের তীর এবং নদীর তীর উভয় অর্থে ব্যাবহার হয়। যে শব্দে এমন ইশতিরাক (اشتراك) বা দ্বৈত অর্থ থাকে ঐ শব্দকে মুশতারাক (مشترك) বলা হয়। উমুম ও ইশতিরাকের মধ্যে এক দিক হতে সাদৃশ্য অন্য দিক হতে বৈশাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের দিকটি হলো উভয়ে একাধিক বস্তু বা বিষয়কে নিজের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে আর বৈশাদৃশ্যটি হলো একটি আম (عام) বা ব্যাপক অর্থের শব্দ একই সময়ে একাধিক অর্থকে বোঝায় আর একটি মুশতারাক (مشترك) বা দ্বৈত অর্থের শব্দ একই সময়ে তার সব কটি অর্থ প্রকাশ করে না বরং হয়তো এই অর্থটি প্রকাশ করবে নয়তো অন্যটি। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক এক স্থানে তিন জন বালক আছে তাদের সকলের নাম যায়েদ। এখন বালক শব্দটি এদের তিন জনের উপরই প্রযোজ্য একইভাবে যায়েদ শব্দটিও এদের তিন জনের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু বালক শব্দটির সাথে যায়েদ শব্দটির পার্থক্য আছে। যদি বলা হয় একজন বালককে ডাকো তবে তিন জনের যে কোনো একজনকে ডাকলেই আদেশ পালিত হবে কিন্তু যদি বলা হয় যায়েদকে ডাকো তবে যে কোনো একজনকে ডাকলে হবে না বরং কোন যায়েদকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তা জানতে হবে। এখানে বালক শব্দটি আম (عام) আর যায়েদ শব্দটি মুশতারাক (مشترك)। পার্থক্য হলো বালক শব্দটি একসাথে তিনজনের উপর প্রযোজ্য হয় আর যায়েদ শব্দটি তিন জনের যে কোনো একজনের উপর প্রযোজ্য হয়।

আর ব্যাপক অর্থের যেসব শব্দ দ্বারা অপেক্ষাকৃত সীমিত অর্থ বোঝানো হয় তার উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী,

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣]

আপনি তাদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করুন। [তাওবা/১০৩]

কেননা সকল মুসলিম একমত যে সকল প্রকারের সম্পদে যাকাত ফরজ নয়।

আর সীমিত অর্থের যেসব শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য করা হয় তার উদাহরণ আল্লাহর বাণী,

{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]

তোমরা পিতামাতার উদ্দেশ্যে উফ্ শব্দ উচ্চারণ করো না। [ ইসরা/২৩]

এখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে তদাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা উফ্ শব্দ উচ্চারণ করতে নিশেধ করা হয়েছে এ থেকে পিতামাতাকে মারধর করা, গালি দেওয়া বা এর উপরে যা কিছু আছে তা নিষিদ্ধ প্রমানিত হয়।

وَهَذِهِ إِمَّا أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْتَدْعَى بِهَا فِعْلُهُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ، وَإِمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَدْعَى تَرْكُهُ، إِمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِصِيغَةِ النَّهْيِ، وَإِمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، وَإِذَا أَتَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ بِهَذِهِ الصِّيَغِ، فَهَلْ يُحْمَلُ اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِهَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ - عَلَى مَا سَيُقَالُ فِي حَدِّ الْوَاجِبِ

---

লেখকের উদাহরণটিকে শুকর বা খিনযীর (خنزير) শব্দটি স্থলের শুকর ও জলের শুকর উভয়ের উপর ব্যাবহার হয় কিন্তু এটা আম নয় বরং মুশতারাক সে কারণে আয়াতের খিনযীর শব্দের মধ্যে পানির খিনযীর অন্তর্ভূক্ত নয়।

এখান থেকে যে মূলনীতি পাওয়া যায় সেটা অতিব প্রয়োজনীয় আর তা হলো কোনো মুশতারাকের একাধিক অর্থের মধ্যে যে কোনো একটি উদ্দেশ্য হবে একই সাথে দুই বা ততোধিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। {উসুলে সারখাশী}

وَالْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ - أَوْ يُتَوَقَّفُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمَا؟ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي صِيَغِ النَّهْيِ، هَلْ تَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ أَوِ التَّحْرِيمِ، أَوْ لَا تَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا.

আদেশ প্রদানের মাধ্যমে কোনো কাজ করার দিকে আহ্বান করা হতে পারে অথবা খবর দেওয়ার ভঙ্গিতে আদেশ করা উদ্দেশ্য হতে পারে। <[১৭]> একই ভাবে যেসব

---

<[১৭]> কাউকে কোনো কাজ করতে বলার জন্য আরবীতে সীগাতুল আমর (صيغة الأمر) বা আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন, আকীমুস সলাহ (اقيموا الصلاة) বা নামায পড়ো। আতুঝ-ঝাকা (آتوا الزكاة) বা যাকাত দাও ইত্যাদি। কখনও কখনও সরাসরি আদেশ প্রদান না করেও কোনো কাজ করার প্রতি আহ্বান করা হয়। যেমন আল্লাহর ﷻ বলেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: ١ - ٣]

ঐ সকল মুমীনরা সফল হয়েছে যারা বিনয়ের সাথে সলাত আদায় করে। যারা অসাঢ় কাজ হতে দূরে থাকে। [মু'মিনুন/১-৩]

এখানে বিনয়ের সাথে সলাত আদায় করো বা অসাঢ় কাজ হতে দূরে থাকো এভাবে বলা হয়নি বরং বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করে ও অসাঢ় কাজ হতে দূরে থাকে এভাবে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে আসলে মুমিনদের এইসব কাজ করতে আহ্বান করা হচ্ছে। অনেক সময় সরাসরি আদেশ না করে এভাবে খবরের মাধ্যমে কোনো কাজ করার দিকে আহ্ববান করা হয়।

রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

খেলাফতের বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে দুজন ব্যাক্তিও বিদ্যমান থাকে।

এখানে খবর দেওয়ার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে খেলাফত কুরাইশদের মধ্যে থাকবে। তোমরা খলীফা নির্বাচণের সময় কুরাইশীকে বাছায় করো এভাবে আদেশ দেওয়া হয়নি কিন্তু সকল আলেমদের মতে এটা খবর হলেও আদেশ অর্থে এসেছে।

এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট উদাহরণ হলো আল্লাহর ﷻ এর কথা,

{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

يَفْقَهُونَ (৬৫) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ } [الأنفال: ৬৫، ৬৬]

যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল থাকে তবে তারা ২০০ জনের বিপক্ষে বিজয়ী হবে আর যদি ১০০ জন হয় তবে কাফিরদের মধ্যে ১০০০ জনের বিপক্ষে বিজয়ী হবে যেহেতু তারা বোধ সম্পন্ন নয়। আল্লাহ এখন তোমাদের উপর হতে বোঝা হালকা করে দিচ্ছেন তিনি জানেন যে যদি তোমাদের মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে অতএব যদি তোমাদের মধ্যে ১০০ জন ধৈর্যশীল থাকে তবে তারা ২০০ জনের বিপক্ষে বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে ১০০০ জন থাকে তবে তারা আল্লাহর ইচ্ছায় ২০০০ জনের বিপক্ষে বিজয়ী হবে। [সূরা আনফাল/৬৫,৬৬]

এখানে সম্পূর্ণ কথাটি বলা হয়েছে খবরের ভঙ্গিতে। ২০ জন বিজয়ী হবে ২০০ জনের বিপ্েক্ষ, ১০০ জন বিজয়ী হবে ১০০০ জনের বিপক্ষে ইত্যাদি। কিন্তু পরে বলা হয়েছে " আল্লাহর তোমাদের বোঝা হালাক করে দিচ্ছেন " এ থেকে বোঝা যাচ্ছে উপরের কথাটি খবর ছিল না বরং আদেশ ছিল। মুমিনদের প্রথমে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেনো তারা তাদের তুলনায় ১০ গুন বেশি সংখক কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করতে পিছপা না হয়। পরে তাদের দূর্বলতা প্রকাশ পেলে এই বিধান লঘু করা হয় এবং দ্বিগুণ কাফিরের মুকাবিলায় পালিয়ে আসা হারাম ঘোষণা করা হয়। আলেমরা এ থেকে প্রমাণ করেছেন যে দ্বিগুণ সংখক কাফিরের মুকাবিলায় পালিয়ে আসা হারাম। অর্থাৎ আয়াতটির বাচন ভঙ্গি খবরের মতো হলেও এখানে আদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য খবর নয়।

একইভাবে কোনো কাজ নিষিদ্ধ করার জন্য কখনও কখনও নিষেধাঙ্গাসূচক শব্দ ব্যাবহার করা হয় যাকে আরবীতে সীগাতুন নাহী (صيغة النهي) বলে। যেমন,

{لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: ১৩০]

সুদ গ্রহণ করো না। [আলে ইমরান/১৩০]

{لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ} [النساء: ১৪৪]

কাফিরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না [নিসা/১৪৪]

ইত্যাদি।

আবার কখনও কখনও সরাসরি নিষেধ না করে খবর দেওয়ার ভঙ্গিতে কোনো কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয। যেমন,

{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ৭৯]

ব্যাপার পরিত্যাগ করা উদ্যেশ্য হবে সেগুলো সরাসরি নিষেধের মাধ্যমে পরিত্যাগ করতে বলা হতে পারে বা খবর দেওয়ার ভঙ্গিতে নিশেধ করা হতে পারে। আর এই সকল শব্দ যখন এই সকল রুপে <[১৮]> আসে তখন এগুলোর মাধ্যমে পরবর্তীতে ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করা হবে সে অনুযায়ী ওয়াজিব উদ্দেশ্য হবে নাকি মুস্তাহাব উদ্দেশ্য হবে <[১৯]> নাকি কোনো দলীল না পাওয়া পর্যন্ত কোনো হুকুম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যা উসুলে ফিকাহর বই সমুহতে উল্লেখিত রয়েছে। <[২০]> নিষেধাঙ্গা সূচক

---

পবিত্রগণ ব্যাতীত ইহা কেউ স্পর্শ করে না। [ওয়াকিয়া/৭৯]

এক শ্রেনীর আলেমের মতে এখানে স্পর্ষ করে না বলতে স্পর্ষ করো না এমন উদ্দেশ্য।

রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه

একজন মুসলিম আরেজন মুসলিমের ভাই সে তার উপর জুলুম করে না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না।

এখানে মুসলিমের উপর জুলুম করা বা তাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যদিও বলা হয়েছে খবরের ভঙ্গিতে।

<[১৮]> সরাসরি আদেশ প্রদান বা খবরের মাধ্যমে আদেশ প্রদানের রুপে আসে।

<[১৯]> ওয়জিব বলতে বোঝায় যা করলে সওয়াব না করলে গোনা আর মুস্তাহাব বলতে বোঝায় যা করলে সওয়াব না করলে কোনো পাপ নেই

<[২০]> কোরআন ও হাদীসের বেশ কিছু স্থানে আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে এই কাজটি করো। এই ধরণের আদেশসূচক শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যাবহৃত হয়ে থাকে।

(১) বহু স্থানে এভাবে আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে উক্ত কাজটি করা আবশ্যক এমন বোঝানো হয়েছে যেমন সালাত আদায় করো যাকাত দাও ইত্যাদি।

(২) আবার কিছু স্থানে আদেশ প্রদানের মাধ্যমে কাজটি বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে এমন বোঝানো হয়নি বরং করলে ভাল না করলে সমস্য নেই তথা মুস্তাহাব বোঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী,

{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ২৮২]

যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকিতে লেনদেন করো তখন তা লিখে রাখো। [বাকারা/২৮২]

এখানে যে লিখে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা বাধ্যতামূলক নয় বরং তা উত্তম যদি কেউ কোনো কারণে লিখে না রাখে তবে তাতে পাপী হবে না।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ

যে কেউ ওযু করে যে নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলুক [ বুখারী ও মুসলি]

এই হাদীস অনসারে কেউ কেউ বলেছেন ওযুতে নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা ফরজ কিন্তু জমহুর আলেমের মতে এটা সুন্নাত। অর্থাৎ তারা এখানে আদেশের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বোঝেননি।

(৩) কখনও কখনও আবশ্যক বা উত্তম কোনো অর্থই প্রকাশ করেনা বরং শুধু মাত্র কাজটির বৈধ হওয়া নির্দেশ করে যেমন, আল্লাহর বাণী,

{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ১০]

যখন সলাত সম্পন্ন হয় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর নেয়ামত তালাশ করো [সূরা জুমআ/১০]

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ২]

যখন তোমরা হজ্জের ইহরাম ভেঙে ফেল তখন শিকার করো [সূরা মায়েদা/২]

একবার সাহাবারা ইহরাম ভেঙে ফেললে রসুলূল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ

তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হও।

ইমাম বুখারী জাবির ﷺ হতে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর এই আদেশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ

(এই আদেশের মাধ্যমে) বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়নি বরং পুরুষদের জন্য স্ত্রীদের বৈধ করা হয়েছে।

এরকম বহু আয়াত রয়েছে যেখানে কোনো কাজ আদেশের ভঙ্গিতে বলা হয়েছে অথচ সেটা বাধ্যতামূলক বা মুস্তাহাব কিছুই নয়। সেটা করলে কোনো পুরস্কারের আশাও নেই বরং সেটা কেবল মাত্র বৈধ বা মুবার (مباح) পর্যায়ের।

(৪) কখনও কখনও সীগাতুল আমর বা আদেশ প্রদানের শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যাবহার করা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী,

{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: ٤٠]

তোমরা যা খুশি আমল করো তিনি তোমরা যা কিছু করো তা দেখেন। [হামিম আস সাজদা/৪০]

এই আয়াতে আদেশের মাধ্যমে উপরের তিনটি অর্থের কোনোটিই উদ্দেশ্য নয়। কেননা এখানে যা খুশি আমল করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে না বা যা খুশি আমল করা বৈধও বলা হচ্ছে না।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যদি তোমার লজ্জা না থাকে তবে যা খুশি তাই করতে পারো। [সহীহ বুখারী]

হাদীসে যার লজ্জা নেই তার জন্য সব কিছু করা বৈধ এমন উদ্দেশ্য নয় বরং তাকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে দুজন লোক অন্য একজনের গীবত করলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ

তোমরা নেমে গিয়ে এই মৃত গাধার মাংস হতে আহার করো।

তারা দুজন অবাক হয়ে বলল,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا

হে আল্লাহর নবী এটা আবার কেউ খায় নাকি?

রসুলূল্লাহ ﷺ বললেন,

فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ

তোমরা একটু পূর্বে তোমাদের এক ভায়ের শানে যা কিছু বলেছো তা এটা খাওয়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

[আবু দাউদ]

এই হাদীস্ওে এটা খাও বলতে উক্ত গাধার মাংস খাওয়া বাধ্যতামূলক, মুস্তাহাব বা বৈধ ইত্যাদি কোনো অর্থই উদ্দেশ্য নয় বরং গীবতের ভয়বহতা বোঝানোর জন্য এভাবে বলা হয়েছে।

আমরা উপরে যে চারটি প্রকারের আলোচনা করলাম তার মধ্যে শেষের দুটি এবং বিশেষ করে চতুর্থ নম্বরটি খুবই স্পষ্ট। আলেমদের মতে শেষের দুটি অর্থ সীগাতুল আমর বা আদেশসূচক শব্দের প্রকৃত অর্থ বা হাকীকত (حقيقة) নয় বরং রুপক অর্থ বা মাযাঝ (مجاز)। সেকারণে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা ছাড়ায় মূল অর্থ হতে এগুলোকে পার্থক্য করা যায়। কিন্তু প্রথমদুটি অর্থের মধ্যে অত্যাধিক সাদৃশ্য রয়েছে। বহু সংখক আলেমের মতে দুটি অর্থই প্রকৃত অর্থ। সে হিসাবে সীগাতুল আমর নিজেই একটি মুশতরাক বা দ্বৈত অর্থবোধক শব্দ। সীগাতুল আমর ব্যাবহার করে যে কাজের আদেশ দেওয়া হলো সেটা ওয়াজিব হবে না মুস্তাহাব হবে এই বিষয়ে আালেমদের মাঝে তিনটি মত রয়েছে,

(১) কোনো কিছুর আদেশ দেওয়া হলে সেটা মূলত ফরজ বলে গণ্য হবে যতক্ষণ না ভিন্ন দলীল পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে উক্ত কাজটি ফরজ নয়।

(২) উক্ত কাজটিকে মূলত মুস্তাহাব বলে মনে করতে হবে যতক্ষণ না সেটা ফরজ হওয়ার পক্ষে ভিন্ন কোনো দলীল পাওয়া যায়।

(৩) দলীল পাওয়া আগ পর্যন্ত ফরজ বা মুস্তাহাব কিছুই বলা হবে না।

এ বিষয়ে প্রথম মতটিই সঠিক। আল্লাহ বলেন,

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: ١٢]

তিনি ইবলীসকে বললেন আমি আদেশ করা সত্ত্বেও তোমাকে সাজদা করতে কিসে বাধা দিলো? [আ'রাফ/১২]

অর্থাৎ শুধু আদেশ করার কারণেই ইবলীস সাজদা করতে বাধ্য ছিল। ইমাম বায়দাবী বলেন,

إِذْ أَمَرْتُكَ دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور

এখানে দলীল রয়েছে যে সাধারণ ভাবে আদেশ করার মাধ্যমে কোনো কিছু বাধ্যতামূলকভাবে তৎক্ষনাৎ আদায় করা উদ্দেশ্য হয়। [তাফসীরে বায়দাবী]

ইবনে হাযার আল আসকালানী বলেন,

وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَهُمَا عَلَى الْإِيجَابِ وَالنَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ

حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيل على خلاف ذلِك وَقَالَ بن بَطَّالٍ هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُور وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ وَالنَّهْيُ عَلَى الْكَرَاهَةِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ فِي الْأَمْرِ وَدَلِيلُ التَّحْرِيمِ فِي النَّهْيِ وَتَوَقَّفَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَسَبَبُ تَوَقُّفِهِمْ وُرُودُ صِيغَةِ الْأَمْرِ لِلْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْإِرْشَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحُجَّةُ الْجُمْهُور أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ اسْتَحَقَّ الْحَمْدَ وَأَنَّ مَنْ تَرَكَهُ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَكَذَا بِالْعَكْسِ فِي النَّهْيِ

কাজী আবু বকর ইবনে তায়্যিব মালিক ও শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে সীগাতুল আমর তাদের দুজনের নিকট কোনো কাজ ফরজ প্রমাণিত করে এবং সীগাতুন নাহী (নিষেধসূচক শব্দ) কোনো কাজ হারাম প্রমাণিত করে যতক্ষণ না এর বিপরীতে দলীল পাওয়া যায়। ইবনে বাত্তাল বলেছেন এটাই জমহুর আলেমের মত। তবে শাফেঈ মাযহাবের অনেক আলেম বলেছেন আদেশের মাধ্যমে প্রথমত মুস্তাহাব আর নিষেধের মাথ্যমে মাকরুহ বুঝতে হবে যতক্ষণ না আদেশের ক্ষেত্রে ফরজ হওয়ার বা নিষেধের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কোনো দলীল পাওয়া যায়। অন্য একদল লোক এ বিষয়ে নিরব থেকেছেন। তাদের নিরব থাকার কারণ হলো আদেশসূচক শব্দ কখনও ওয়াজিব বোঝায় কখনও মুস্তাহাব বোঝায় কখনও বৈধ বোঝায় কখনও শুধু মাত্র কোনো কাজের দিকে পথ দেখানো বোঝায় ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়। জমহুর আলেমের দলীল হলো যে কেউ এমন কোনো কাজ করে যা তাকে করতে বলা হয়েছিল সে প্রশংসিত হয় আর যে তা পরিত্যাগ করে যে নিন্দিতহয় একইভাবে যে কাজ হতে কাউকে নিষেধ করা হয়েছিল সে কাজ করলে সে নিন্দিত হয় না করলে প্রশংসিত হয়।

[ফাতহুল বারী]

সুতরাং আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো সীগাতুল আমর বা আদেশ সূচক শব্দের মাধ্যমে মূলত কোনো কাজকে বাধ্যতামূলক বুঝতে হবে যতক্ষণ না এর বিপরীতে কোনো দলীল পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে এই বিপরীত দলীলগুলো কি? এই ধরনের দলীল বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন,

ক . যে বিষয়টির আদেশ দেওয়া হচ্ছে সেটি ফরজ না হওয়ার পক্ষে ভিন্ন দলীল থাকা। যেমন বিভ্ন্নি হাদীসে বিতরের সলাত আদায় করার আদেশ এসেছে কিন্তু সমস্ত আলেমদের মতে বিতরের সলাত ফরজ নয় কারণ অন্য একটি হাদীসৈ এসেছে একজন ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসুলূল্লাহ ﷺ বললেন,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

রাত দিনে পাচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা।

উক্ত ব্যাক্তি আমার উপর এ ছাড়া অন্য কিছু ফরজ কি? রসুলূল্লাহ ﷺ বলেলন না। [সহীহ বুখারী]

তাছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ উটের উপর বসে বিতর সলাত আদায় করেছেন আর ফরজ সলাত বসে আদায় করা হয় না। এসব দলীলে কারণে প্রমাণিত হয় যে বিতর সম্পর্কে যে আদেশ

দেওয়া হয়েছে তা বাধ্যতামূলক বা ফরজ বিধান নয়।

খ . যখন বোঝা যায় আদেশ বা নিশেধের মধ্যে অন্য কোনো কারণ রয়েছে তখন উক্ত কারন উপস্থিত না থাকলে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য হবে না। যেমন, খন্দকের যুদ্ধের পর রসুলূল্লাহ ﷺ সাহবাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

বনু কুরাইজাতে না গিয়ে যেনো কেউ আসরের সলাত আদায় না করে। [সহীহ বুখারী]

পরে বনু কুরাইজাতে পৌছানো পূর্বেই আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যে লিপ্ত হন। একদল বলেন আমরা বনু কুরাইজাতে না গিয়ে আসরের সলাত আদায় করবো না যেহেতু আল্লাহর রসুল আমাদের এমন নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য একদল বলেন তিনি একথা এই উদ্দেশ্যে বলেননি বরং তিনি চেয়েছেন যেনো আমরা দ্রুত যাত্রা করি যাতে আসরের সালাত সঠিক সময়ে বনু কুরাইজাতে আদায় করতে পারি।

গ . যদি এমন মনে হয় যে কোনো আদেশ আমাদের সুবিধার্থে দেওয়া হচ্ছে আদিষ্টকাজটি বাধ্যতামূলক করার জন্য নয়। যেমন আল্লাহর বাণী,

{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ২৮২]

যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকিতে লেনদেন করো তখন তা লিখে রাখো। [বাকারা/২৮২]

এখানে যে লিখে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা বাধ্যতামূলক নয বরং তা উত্তম যদি কেউ কোনো কারণে লিখে না রাখে তবে তাতে পাপী হবে না। এই আয়াত হতে উক্ত বিধানটি ফরজ প্রমাণিত না হওয়ার কারণ হলো বিধানটি বান্দাদের প্রতি দয় পরবশ হয়ে এবং তাদের সুবিধার্তে নাযিল করা হয়েছে যদি কেউ নিজের সুবিধা পরিত্যাগ করে এবং লেখালেখি বা সাক্ষ প্রমাণ ছাড়ায় কোনো মুসলিম ভাইকে ঋণ দেয় তবে সেটা বৈধ হবে যদিও লেখালেখি করাটাই উত্তম।

রসুলূল্লাহ ﷺ একবা অনুপস্থিত থাকলে আবু বকর ﷺ লোকদের নিয়ে সলাত আদায করতে শুরু করেন। তাদের সালাত শুরু হওয়ার পর রসুলুল্লাহ ﷺ হাজির হলে আবু বকর ﷺ পিছনে ফিরে আসতে শুরু করেন। রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে হাত দ্বারা ইশারা করে যথা স্থানে থাকতে আদেশ করেন তবু আবু বকর ﷺ পিছনে ফিরে আসেন। রসুলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করার পর তাকে প্রশ্ন করলেন,

يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك

হে আবু বকর আমি তোমাকে আদেশ করার পরও তুমি কেনো স্থীর থাকলে না? [বুখারী ও মুসলিম]

আবু বকর ﷺ বললেন, আপনি হাজির থাকার পরও আবু কুহাফার ছেলের জন্য ইমাম হয়ে সালাত আদায় করাটা শোভা পায় না।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আন নাব্বী বলেন,

وَفِيهِ أَنَّ التَّابِعَ إِذَا أَمَرَهُ الْمَتْبُوعُ بِشَيْءٍ وَفَهِمَ مِنْهُ إِكْرَامَهُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ لَا تَحَتُّمُ الْفِعْلُ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَلَا يَكُونُ هَذَا مُخَالَفَةً لِلْأَمْرِ بَلْ يَكُونُ أَدَبًا وَتَوَاضُعًا وَتَحَدُّقًا فِي فَهْمِ الْمَقَاصِدِ

এতে দলীল রয়েছে যে যদি কোনো অনুসারীকে তার অনুসরণীয় ব্যাক্তি কোনো কাজের আদেশ করে আর উক্ত ব্যাক্তি বুঝতে পারে এই আদেশের মাধ্যমে উক্ত কাজটি বাধ্যতামূলক করা উদ্দেশ্য নয় বরং তাকে মর্যাদা দেওয়া উদ্দেশ্য তবে সে এই নির্দেশ পরিত্যাগ করতে পারে এটা অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে না বরং আদব, বিনম্রতা ও ভাষা বোঝার দক্ষতা বলে পরিগনিত হবে। [শারহে মুসলিম]

এরকম আরো বহু সংখক বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে ফরজ ও মুস্তাহাবের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। এই বইটির বিভিন্ন মাসয়ালা প্রসঙ্গে আলোচনাতে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

সীগাতুল আমর বা আদেশসূচক শব্দের ব্যাপারে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে লেখক আলোকপাত করেন নি। আমরা সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে চাই।

ক . সীগাতুল আমর বা আদেশ সূচক শব্দের মাধ্যমে কোনো কাজ কয়বার করা ফরজ হয় সেবিষয়ে কিছু দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন সীগাতুল আমর কোনো কিছু বারবার আদায় করার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন সলাত, সওম, যাকাত ইত্যাদি আমলগুলো প্রতিবছর আদায় করা ফরজ। কেউ বলেছেন বরং সীগাতুল আমরের মাধ্যমে কোনো কাজ একবার করা করা ফরজ বলে প্রতিয়মান হয় বারবার নয় আর সলাত, সওম যাকাত ইত্যাদি প্রতি বছর আদায় করা হয় অন্য দলীলে ভিত্তিতে শুধু সীগাতুল আমরের উপর ভিত্তি করে নয় যেমন হজ্জ প্রতি বছর আদায় করা ফরজ নয় বরং জীবনে একবার করা ফরজ। তৃতীয় একদল আলেমের মতে সীগাতুল আমর নিজে একবার বা বারবার কিছুই প্রকাশ করে না বরং এর কোনো একটি প্রকাশ করতে হলে সে বিষয়ে দলীল প্রয়োজন তবে বারবার করতে হবে এমন দলীল পাওয়া না গেলে কমপক্ষে একবার করা ফরজ হবে। শেষের দুটি মত একইরুপ। এই মতটিই বেশিরভাগ আলেমের মত ইমাম ইবনে জারীর তাবারী এটাকেই সঠিক বলেছেন। এর দলীল হলো একটি হাদীস যেখানে বলা হয়েছে রসুলূল্লাহ ﷺ একবার বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا

হে মানবসকল আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন অতএব তোমরা হজ্জ করো।

তখন একজন ব্যাক্তি বলল, হে আল্লাহর রসুল এটা কি প্রতি বছর? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لَوْ قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

আমি যদি হ্যা বলতাম তবে প্রতিবছরই ফরজ হয়ে যেতো আর তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। [সহীহ মুসলিম]

এর পর তিনি অধিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী বলেন,

وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَقْتَضِيهِ وَالثَّانِي يَقْتَضِيهِ وَالثَّالِثُ يَتَوَقَّفُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ عَلَى الْبَيَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِاقْتِضَائِهِ ولا يمنعه

সীগাতুল আমরের মাধ্যমে কোনো কাজ বারবার করা বাধ্যতামূলক হয় কিনা সে বিষয়ে উসুলবিদরা মতপার্থক্য করেছেন আমাদের মাযহাবের আলেমদের নিকট এটা বারবার করা বাধ্যতামূলক করে না তবে কেউ কেউ বলেছেন করে তৃতীয় আরেকদল বলেছেন (কমপক্ষে) একবার বাধ্যতামূলক হবে তার উপরে হবে কি না সে বিষয়ে হ্যা বা না কিছুই বলা হবে না [শারহে মুসলিম]

উপরে উল্লেখিত হাদীসটিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যদি হ্যা বলতাম তাহলে প্রতিবছর করা ফরজ হয়ে যেতো। এ থেকে বোঝা যায় বারবার ফরজ হতে হলে ভিন্ন দলীলে প্রয়োজন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, আদেশ প্রদানের মাধ্যমে কোনো কাজ কেবল মাত্র একবার করা বাধ্যতামূলক হয় যদি না অন্য কোনো দলীল পাওয়া যায় যার মাধ্যমে বারবার আদায় করা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রমাণিত হয় যেমন পাওয়া গেছে সালাত, সওম, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

একারণে আলেমগণ আল্লাহর বাণী,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ } [الأحزاب: ৫৬]

হে ঈমানদাররা তোমরা নবীর উপর দরুদ পড়ো [আহযাব/৫৬]

এই আয়াত হতে নবীর উপর জীবনে কমপক্ষে একবার দরুদ পড়া ফরজ বলে মত দিয়েছে।

খ . সীগাতুল আমর ব্যাবহার করে কোনো কাজের আদেশ দিলে সেটা তৎক্ষনাৎ (علي الفور) আদায় করতে হবে নাকি বিলম্ব করা বৈধ হবে সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। উপরে ইমাম বায়দাবী হতে একটি মত উল্লেখ করেছি তিনি সূরা আরাফের একটি আয়াত হতে সীগতুল আমরের মাধ্যমে কোনো কাজ তৎক্ষনাৎ বাধ্যতামূলক হওয়ার পক্ষে দলীল দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: ١٢]

তিনি (ইবলীসকে) বললেন আমি আদেশ করা সত্ত্বেও তোমাকে সাজদা করতে কিসে বাধা দিলো? [আ'রাফ/১২]

অর্থাৎ শুধু আদেশ করার কারণেই ইবলীস সাজদা করতে বাধ্য ছিল। ইমাম বায়দাবী বলেন,

إِذْ أَمَرْتُكَ دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور

এখানে দলীল রয়েছে যে সাধারণ ভাবে আদেশ করার মাধ্যমে কোনো কিছু বাধ্যতামূলকভাবে তৎক্ষনাৎ আদায় করা উদ্দেশ্য হয়। [তাফসীরে বায়দাবী]

এই বিষয়টিতে উসুলবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণনা করা হয় যে তারা তৎক্ষণতাৎ বাধ্যতামূলক হওয়ার পক্ষে ছিলেন। হানাফী মযহাবের আলেম আর কারখী হতে এই মত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেঈ হতে বিপরীত মত বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ তার মত ছিল সীগাতুল আমর ব্যাবহার করে কোনো কিছুর আদেশ প্রদান করলে তা তৎক্ষণাত ফরজ হয় না। কেউ কেউ বলেছেন এটাই বেশিরভাগ উসুলবিদের মত।

উভয় মতের মাঝে পর্থক্য হলো যদি প্রথম মত গ্রহণ করা হয় তবে হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত সক্ষম হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা ফরজ হবে আর যদি দ্বিতীয় মত গ্রহণ করা হয় তবে যাকাতের বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায় করতে দেরি করা বা হজ্জে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিলম্ব করা বৈধ হবে।

এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো সীগাতুল আমর নিজে বিলম্ব বা তাৎক্ষনিক কিছুই বোঝায় না তবে এতদূর বিলম্ব করা বৈধ নয় যাতে অবহেলা বা অলসতা প্রকাশ পায়। এর পক্ষে দলীল আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত হাদীস যেখানে তিনি বলেন,

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان

আমার উপর রমযান মাসের কাযা রোজা থাকে পরবর্তী শাবান পর্যন্ত আমি তা আদায় করতে পারি না। [সহীহ বুখারী]

যারা রমযান মাসে অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে কিছু রোজা আদায় করতে পারে না তাদের পরবর্তীতে আদায় করে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তৎক্ষনাৎ আদায় করা বাধ্যতামূলক হতো তবে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ﵂ পরবর্তী শাবান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন না।

এক কথায় ততটুকু বিলম্ব করা বৈধ হবে যতটুকু বিলম্ব করলে অবহেলা ও অলসতা প্রকাশ না পায়

বাক্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা অর্থাৎ সেটা কি হারাম প্রমান করবে নাকি মাকরুহ প্রমানিত করবে নাকি দলীল ছাড়া এর কোনোটাই প্রামানিত করবে না এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে উসুলে ফিকাহর গ্রন্থসমূহতে এ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। <[২১]>

---

এটা বিভিন্ন অবস্থা ও সময়সাপেক্ষে নির্ণিত হয়।

ইবনুল আরাবী এবিষয়ে খুব সুন্দর কথা বলেছেন,

والذي نعتقده إن التأخير جائز وإن المبادرة حزم

আমাদের কথা হলো বিলম্ব করা বৈধ তবে দ্রুত আদায় করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

<[২১]> উপরে সীগাতুল আমর (صيغة الامر) সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে সীগাতুন নাহী (صيغة النهي) বা নিষেধাঙ্গা সূচক শব্দের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য। শুধু নিচের দুটি বিষয় ছাড়া। কারণ কোনো কিছু থেকে বিরত হওয়ার আদেশ দিলে সেটা হতে চিরোকাল বিরত থাকতে হবে একবার বিরত হলেই হবে না এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ বা বিলম্বের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এ দুটি ছাড়া সীগাতুল আমর সম্পর্কে অন্য যা কিছু বলা হয়েছে তার সবটুকুই সীগাতুন নাহীর উপর প্রযোজ্য হয়। সীগাতুন নাহী বা নিষেধাঙ্গাসূচক শব্দ সীগাতুল আমরের মতো বিভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়। যেমন,

(১) কোনো কিছু নিষিদ্ধ বা হারাম সাব্যস্ত করার জন্য। যেমন (لا تقربوا الزنـي) তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়োনা (لا تأكلوا الربي) সুদ খেয়ো না ইত্যাদি।

(২) হারাম নয় বরং মাকরুহ বোঝানোর জন্য। উম্মে আতীয়্যা বলেন,

نهيما عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

আমাদের (মেয়েদের) জানাযার (মৃতদেহ) পিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে তবে এটা হারাম করা হয়নি। [সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ অনেক সময় কোনো কিছু হতে নিষেধ করা হয় কিন্তু এর মাধ্যমে হারাম করা উদ্দেশ্য হয়না তবে উক্ত কাজটি পরিত্যাগ করা উত্তম এমন উদ্দেশ্য হয়।

(৩) অনেক সময় কোনো কাজ কররে নিষেদ করা হয অথচ তার মাধ্যমে কাজটি হারাম বা মাকরুহ

وَالْأَعْيَانُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحُكْمُ إِمَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهَا بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ فِي صِنَاعَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ بِالنَّصِّ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهَا بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى وَاحِدٍ، وَهَذَا قِسْمَانِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ عَلَى تِلْكَ الْمَعَانِي بِالسَّوَاءِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ

---

উদ্দেশ্য নয় বরং কাজটি বৈধ। রসুলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

তুমি সাত দিনে কোরান খতম করো এর অধিক করো না। [সহীহ বুখারী]

এ বিষয়ে আলেমদের মতামত হলো কোরানের অর্থে বা তিলাওয়ে কোনোরুপ অস্পষ্টতা সৃষ্টি না করে যত কম সময়ে পারা যায় তেলাওয়াত করতে দোষ নেই। বহু সংখক সালাফ হতে তিন দিনের কম সময়ে কোরান তিলাওয়াত করার প্রমাণিত আছে এ বিষয়ে ফাতহুল বারীতে লম্বা ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

(৪) অনেক সময় সীগাতুল অমরের মতো সীগাতুন নাহীও সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যাবহুত হয়। নুহ $ তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বললেন,

{ثم اقضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُون} [يونس: ٧١]

তোমরা আমাকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করো আর আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না। [ইউনুস/৭১]

এখানে অবকাশ দিয়োনা এই কথার মাধ্যমে আসলে অবকাশ দিতে নিষেধ করা হচ্ছে না বরং এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে সীগাতুন নাহী ব্যাবহার করা হয়েছে।

সীগাতুন নাহী যেহেতু বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় সে কারণে সীগাতুল আমরের ব্যাপারে যে মতপার্থক্য হয়েছে তা সীগাতুন নাহীর ব্যাপারেও হয়েছে। (১) কেউ বলেছে প্রথমত আমরা এ থেকে কোনো কিছু হারাম হওয়া বুঝবো যদি না কোনো দলীলের মাধ্যমে ভিন্নরকম কিছু প্রমাণিত হয়। (২) অনেকের মত এর মাধ্যমে প্রথমত মাকরুক বুঝতে হবে যতক্ষণ না হারাম হওয়ার পক্ষে দলীল পাওয়া যায়। (৩) কেউ কেউ বলেছেন উভয়ের কোনটি উদ্দেশ্য হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যতক্ষণ না কোনো একটি পক্ষে দলীল পাওয়া যা।

এক্ষেত্রেও প্রথম মতটিই সঠিক। অর্থাৎ নিষেধ করা থেকে প্রথমত বুঝতে হবে হারাম হওয়া তবে এর বিপরীতে কোনো দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। এই বিপরীত দলীল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমনটি সীগাতুল আমরের আলোচনাতে আমরা উল্লেখ করেছি।

بِالْمُجْمَلِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُوجِبُ حُكْمًا، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْمَعَانِي أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، وَهَذَا يُسَمَّى بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَعَانِي الَّتِي دَلَالَتُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ ظَاهِرًا، وَيُسَمَّى بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَعَانِي الَّتِي دَلَالَتُهُ عَلَيْهَا أَقَلُّ مُحْتَمِلًا. وَإِذَا وَرَدَ مُطْلَقًا حُمِلَ عَلَى تِلْكَ الْمَعَانِي الَّتِي هُوَ أَظْهَرُ فِيهَا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمُحْتَمِلِ، فَيَعْرِضُ الْخِلَافُ لِلْفُقَهَاءِ فِي أَقَاوِيلِ الشَّارِعِ، لَكِنَّ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ: مِنْ قِبَلِ الِاشْتِرَاكِ فِي لَفْظِ الْعَيْنِ الَّذِي عُلِّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَمِنْ قِبَلِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْأَلِفِ وَاللَّامِ الْمَقْرُونَةِ بِجِنْسِ تِلْكَ الْعَيْنِ، هَلْ أُرِيدَ بِهَا الْكُلُّ أَوِ الْبَعْضُ؟ وَمِنْ قِبَلِ الِاشْتِرَاكِ الَّذِي فِي أَلْفَاظِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي.

যে সকল বিষয়ের উপর কোনো হুকুম দেওয়া হয় সেগুলো বর্ণনা করার জন্য এমন একটি শব্দ ব্যাবহার করা হতে পারে যা কেবল মাত্র একটি অর্থ বহন করে উসুলে ফিকহের পরিভাষায় এটাকেই নাস (نص) বলা হয়। এই ধরনের বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। <[২২]> আবার এমনও হতে পারে যে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার জন্য এমন একটি শব্দ ব্যাবহার করা হচ্ছে যার একাধিক অর্থ রয়েছে। <[২৩]> এটা আবার দুরকম হতে পারে,

(১) একাধিক অর্থের মধ্যে কোনোটির সম্ভাবনা কোনোটি অপেক্ষা বেশি নয়। উসুলে

---

<[২২]> কোরআন হাদীসের বেশিরভাগ অংশই এই ধরণের। যেমন আল্লাহ বলেন, ''চোর পুরুষ হোক বা নারী হোক তার হাত কেটে দাও।'' এখানে চোর বলতে কি বোঝায় বা হাত কাটা বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি সব কিছুই স্পষ্ট কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বৈততা (اشتراك) নেই। এই ধরণের স্পষ্ট নির্দেশকে উসুলের পরিভাষায় নাস (نص) বলা হয়। কোনো মুসলিম আল্লাহ ও তার রসুলে স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা করতে পারে না।

<[২৩]> আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে সেটাকে মুশতারাক (مشترك) বলা হয়। যেমন তীর শব্দটি ধনুকের তীর ও নদীর তীর উভয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। আরবীতে বহু শব্দের মধ্যে এই ধরণের ইশতিরাক (اشتراك) বা দ্বৈত অর্থ রয়েছে। যেমন কুরু (قروء) শব্দটি হায়েজ ও তুহর দুই অর্থে ব্যাবহার হয়। শাফাক (شفق) শব্দটি সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে যে লাল রঙ বা উক্ত লাল রঙ আদৃশ্য হওয়ার পরও যে সাদা রং বিদ্যমান থাকে এই উভয় রঙের উপর ব্যাবহার হয়। এ কারণে ইমামদের মাঝে মাগরিবের সলাতের ওয়াক্ত নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

ফিকহের পরিভাষায় এটাকে মুজমাল (مجمل) বলা হয়। কোনো মতপার্থক্য নেই যে মুজমালের মাধ্যমে কোনো বিধান আবশ্যক হয় না। <[২৪]>

---

<[২৪]> মুহাক্কিক আলেমগণ মুজমাল আর মুশতারাকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মুশতারাক (مشترك) বলতে বোঝায় একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। এ ক্ষেত্রে আলেমগণ ভাষার উপর চিন্তা গবেষণা করে যে কোনো একটি অর্থ বাছায় করার চেষ্টা করে থাকেন। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্যও হয় যেমন কুরু (قروء) বা শাফাক (شفق) শব্দটির ক্ষেত্রে হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ বা তার রসুলের পক্ষ হতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত কেবল ভাষার উপর চিন্তাভাবনা করে যে শব্দের অর্থ বোঝা সম্ভব হয় না সেটাকে উসুলের পরিভাষায় মুজমাল (مجمل) বলে। যেমন আল্লাহ বললেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦]

হে ঈমানদাররা তোমরা নবীর উপর দরুদ পড়ো [আহযাব/৫৬]

সাহাবায়ে কিরাম কেবল ভাষাভিত্তিক অর্থের উপর নির্ভর করে নবীর উপর দরুদ পড়ার অর্থ কি তা বুঝতে সক্ষম হন নি। তারা আল্লাহর রসুলের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন,

قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك

আমরাতো আপনার উপর সালাম দেওয়া বলতে কি বোঝায় তা জানি কিন্তু আপনার উপর দরুদ পড়ার অর্থ কি?

এর পর রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের দরুদে ইব্রাহিমী শিক্ষা দেন।

এভাবে সলাত, সওম, যাকাত ইত্যাদি সকল শব্দই মুজমাল। যেহেতু আল্লাহ বা তার রসুলের পক্ষ হতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়া কেবল ভাষার মাধ্যমে এগুলোর অর্থ বুঝা সম্ভব নয়।

তাহলে মুশতারাক ও মুজমালের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো

ক . মুশতারাকের একাধিক অর্থ থাকে তার মধ্যে কোনটি উদ্দেশ্য তা বোঝা যায় না আর মুজমালের কোনো অর্থই বুঝে আসে না।

খ . মুশতারাক ভাষা ভিত্তিক অর্থেই ব্যাবহার হয় তায় ভাষার উপর চিন্তাভাবনা করে তার অর্থ বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু মুজমাল শরীয়তের নিজস্ব পরিভাষায় ব্যাবহৃত হয় ফলে আল্লাহ বা তার রসুলের পক্ষ হতে ব্যাখ্যা ছাড়া তা বোধগম্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

মুজমালের মাধ্যমে কোনো বিধান প্রমাণিত হয়না এর অর্থ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তে তার কোনো

(২) এমনও হতে পারে যে ঐ সকল অর্থের মধ্যে কোনোটি উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট আর কোনেটির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম যে অর্থটির উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অন্য অর্থগুলোর সাথে তুলনা করে সেটিকে প্রকাশ্য (ظاهر) অর্থ বল হয়। আর তুলনামুলকভাবে যে অর্থগুলোর উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম সেগুলোকে মুহতামাল (محتمل) বলা হয়।

এই ধরনের শব্দ যখন সাধারনভাবে আসে তখন অধিক প্রকাশ্য অর্থটি গ্রহণ করা হয় <[২৫]> যদি না এমন কোনো দলীল পাওয়ার যায় যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে কম সম্ভাবনাময় কোনো একটি অর্থ উদ্দেশ্য। এভাবে শরীয়তের আদেশ নিশেধ বোঝার ক্ষেত্রে ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য হয়। এই মতপার্থক্য তিনটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে,

(১) যে বস্তু বা বিষয়ের উপর বিধান জারি করা হচ্ছে সেটি প্রকাশের জন্য যে শব্দটি ব্যবাহার করা হয়েছে তাতে ইশতিরাক (اشتراك) বা দ্বৈত অর্থ বিদ্যমান থাকা। <[২৬]>

(২) উক্ত শব্দের প্রথমে যুক্ত আলিফ লামের অর্থের ব্যাপারে দুরকম সম্ভাবনা থাকা অর্থাৎ সেটির মাধ্যমে সকল প্রকার উদ্দেশ্য নাকি কিছু প্রকার উদ্দেশ্য তা অনিশ্চিত হওয়া। <[২৭]>

---

ব্যাখ্যা পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আমল করা সম্ভব হয় না।

<[২৫]> কোনো মুশতারাক শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে কোনটি উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তা নির্ণয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ হতে পারে। কারো নিকট একটি অর্থ অধিক প্রকাশ্য অন্য কারো নিকট অন্য কোনো অর্থ অধিক প্রকাশ্য বা জাহির (ظاهر) মনে হতে পারে। পরবর্তীতে লেখক সেই মতপার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

<[২৬]> যেমন কুরু (قروء) , শাফাক (شفق), ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর একাধিক অর্থ রয়েছে তায় কোনো আয়াতে বা হাদীসে এসব শব্দের কোনোটি ব্যাবহার করা হলে মতপার্থক্যের সুযোগ থেকে যায়।

<[২৭]> আরীতে কোনো শব্দের প্রথমে আলিফ লাম (ال) বা আল যোগ করে তা'রীফ (নির্দিষ্টকরণ) করা হয়। এটি প্রধানত দুটি অর্থে ব্যাবহৃত হয়।

(১) জিনস (جنس) বা সমস্ত জাতি বুঝানোর জন্য।

যে শব্দের প্রথমে আলিফ লাম (ال) ব্যবাহৃত হয় কখনও তার সম্পূর্ণ অর্থকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

{ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ} [يونس: ১০৩]

আমরা উপর দায়িত্ব যে, আমি মুমিনদের মুক্তি দেবো। [ইউনুস/১০৩]

এখানে মুমিনুন (مؤمنون) শব্দের প্রথমে যে আলিফ লাম (ال) ব্যাবহার করা হয়েছে সেটার উদ্দেশ্য হলো সকল মুমিনদের অন্তভূর্ক্ত করা। এই প্রকারের আলিফ লাম (ال) কে জিনসী (جنسي) বলা হয়।

(২) কখনও কখনও আলিফ লাম আহদ (عهد) এর জন্য ব্যাবহৃত হয়।

আহদ (عهد) অর্থ নির্দিষ্ট বা পরিচিত কোনো বস্তু বা বিষয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

{ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ২]

এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই। [বাকারা/২]

এখানে কিতাব (كتاب) শব্দের প্রথমে যে আলিফ লাম (ال) যোগ করা হয়েছে সেটা আহদের জন্য অর্থাৎ এখানে সকল কিতাবকে বোঝাচ্ছেনা বরং নির্দিষ্ট ও পরিচিত একটি কিতাবকে বোঝাচ্ছে।

আলিফ লাম (ال) এর মধ্যে যে ইশতিরাক বা দ্বৈততা রয়েছে সে কারণে অনেক সময় কোনো আয়াত বা বিধানের অর্থ বুঝার ব্যাপারে দ্বিমত হতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন,

{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: ৩৬]

ছেলেরা তো মেয়েদের মতো নয়। [আলে ইমরান/৩৬]

এখানে যদি আলিফ লামের প্রথম অর্থ ধরা হয় তবে অর্থ হবে এমন " ছেলেরা তো মেয়েদের মতো নয়" আর যদি দ্বিতীয় অর্থ ধরা যায় তবে অর্থ হবে ছেলেটি তো মেয়েটির মতো নয়। অর্থাৎ মারইয়াম $ এর মাতা যে পুত্র সন্তান কামণা করেছিলেন সেই পুত্র সন্তানটি তাকে যে কন্য সন্তান দেওয়া হয়েছে সেটার সমান নয়।

বাংলাতে ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। নিচের দুটি প্রশ্নের দিকে লক্ষ করুন,

তুমি কি গাছটি কেটেছো?

(৩) আদেশ ও নিশেধ করার যে শব্দসমূহ রয়েছে সেগুলোর মধ্যেই ইশতিররাক বা

---

তুমি কি গাছ কেটেছো?

দুটি প্রশ্নতেয় গাছ কাটা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে কিন্তু প্রথমটিতে একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে প্রশ্ন করছে আর যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে উভয়ের নিকট উক্ত গাছটি পরিচিত ও চেনা যদি উক্ত নির্দিষ্ট গাছটি না কেটে থাকে তবে হ্যা উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় প্রশ্নে সাধারণ ভাবে সকল গাছ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কোনো একটি গাছ কেটে থাকলেই এ ক্ষেত্রে হ্যা বলা যায়। আরবীতে দুটি প্রশ্নই একই রকম হবে। বলা হবে,

هل قطعت الشجر؟

এখানে শাজার (شجر) অর্থ গাছ। শাজার (شجر) শব্দটির পূর্বে আলিফ লাম (ال) যোগ করা হয়েছে। যদি আলিফ লাম জিনসী (جنسي) ধরা হয় তবে সাধারণ ভাবে সকল গাছকে বোঝাবে অর্থাৎ বাংলার দ্বিতীয় প্রশ্নটির অর্থ প্রকাশ করবে আর যদি আলিম লাম (ال) কে আহদী (عهدي) অর্থে নেওয়া হয় তবে পরিচিত ও নির্দিষ্ট একটি গাছকে বোঝাবে অর্থাৎ বাংলা প্রশ্ন দুটির প্রথমটির অর্থ প্রকাশ করবে।

এতদূর জানার পর আশা করি সহজেই বোঝা যাবে যে আলীফ লামের মধ্যে ইশতিরাক বা দুরকম অর্থ থাকার কারণে কিভাবে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করবো। দুজন লোকের কবরে আযাব হতে দেখে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَكَانَ الآخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ

এদের মধ্যে একজন প্রসাব হতে পবিত্রতা অর্জন করতো না।

এখানে প্রসাব বা বাওল (بول) শব্দের পূর্বে আলিফ লাম (ال) যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ যদি জিনসী (جنسي) ধরা হয় তবে সকল প্রকারের প্রসাব এর মধ্যে অন্তভূর্ক্ত হবে। যেমন মানুষের প্রসাব বা গৃহপালিত জন্তুর প্রসাব ইত্যাদি। আর যর্দি আলিফ লাম (ال) কে আহদী (عهدي) ধরা হয় তবে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট প্রকার বা প্রকৃতির প্রসাব এর মধ্যে অন্তভূর্ক্ত হবে অর্থাৎ মানুষের প্রসাব।

সকল প্রকারের প্রসাব নাপাক কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে সকল প্রকারের প্রসাব নাপাক। অপর দিকে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের মতে যেসকল পশুর মাংস খাওয়া যায় তাদের প্রসাব নাপাক নয়। এই মতপার্থক্যের সাথে আলিফ লামের উক্ত ইশতিরাক (اشتراك) বা দ্বৈততার সম্পর্ক রয়েছে।

দ্বৈত অর্থ থাকা। <[২৮]>

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَهُوَ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ إِيجَابِ الْحُكْمِ لِشَيْءٍ مَا نَفْيُ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَا ذَلِكَ الشَّيْءِ، أَوْ مَا نَفْيُ الْحُكْمِ عَنْ شَيْءٍ مَا إِيجَابُهُ لِمَا عَدَا ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي نُفِيَ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ، وَهُوَ أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، مِثْلَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - র فِي سَائِمَةِ

শরীয়তের বিধান অবগত হওয়ার চতুর্থ প্রকারটি <[২৯]> হলো কোনো বস্তুর উপর কোনো বিধান ওয়াজিব করা হলে তা থেকে অন্য বস্তুতে সেটি ওয়াজিব নয় এমন বুঝ গ্রহণ করা <[৩০]> বা কোনো বস্তুতে কোনো বিধান প্রযোজ্য নয় এমন বলা হলে ওটা

---

<[২৮]> সীগাতুল আমর (صيغة الامر) এবং সীগাতুন নাহী (صيغة النهي) যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে লেখক এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করছেন। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করেছি। এর কারণে কিভাবে মতপার্থক্য ঘটে তাও বর্ণনা করেছি। ২১ ও ২২ নং টিকা দ্রষ্টব্য।

<[২৯]> লেখক প্রথমেই বলেছেন শরীয়তের বিধিবিধান আমরা রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হতে তিনটি পন্থায় অর্জন করি (১) কথার মাধ্যমে (২) কাজের মাধ্যমে (৩) সম্মতির মাধ্যমে। তার পর তিনি কথার মাধ্যমে কিভাবে শরীয়তের বিধিবিধান অর্জিত হয় সে প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনার প্রথমেই তিনি বলেছেন,

“ যে সকল মৌখিক কথার মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধান অবগত হওয়া যায় সেগুলো চার প্রকার। তিনটির ব্যাপারে সকলে একমত আর একটির ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।”

এতক্ষণ পর্যন্ত যে তিনটির ব্যাপারে সকলে একমত সেগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এখন চতুর্থ প্রকারটির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

<[৩০]> যেমন রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

في سائمة الغنم الزكاة

সেসব ছাগল খোলা মাছে চরে ফিরে খায় তাদের সংখা যখন ৪০ হয় তখন তার উপর একটি ছাগল যাকাত হিসাবে ফরজ হয়। [মুয়াত্তা মালিক]

এই হাদীস হতে আলেমরা বলেছেন যেসব পশু বাড়িতে খাওয়ানো হয় তাদের উপর যাকাত ফরজ নয়। হাদীসে কেবল যেসব ছাগল মাঠে চরে খায় তাদের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো মাঠে চরে না বা বাড়িতে খায় তাদের বিধান কি সে সম্পর্কে সরাসরি কিছুই বলা হয়নি কিন্তু হাদীস থেকে বোঝা

ছাড়া অন্য বস্তুতে উক্ত বিধান প্রযোজ্য এমন বুঝ গ্রহন করা। <[৩১]> এই বিষয়টিকেই উসুলের পরিভাষায় দালীলুল খিতাব (دليل الخطاب) বলা হয়। <[৩২]> আর এই উৎসটির

---

যাচ্ছে যে পশু বাড়িতে খাওয়ানো হয় তার বিধান মাঠে চরে খাওয়া পশুর চেয়ে ভিন্ন হবে। এ থেকে আলেমরা মত দিয়েছেন যে, বাড়িতে খাওয়ানো পশুতে যাকাত নেই। তাহলে এখানে যে বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে তা হতে যে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি তার বিধান কি তা নির্ণয় করা হচ্ছে।

<[৩১]> যেমন তিন আল্লাহ বলেন,

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ৯৬]

তোমাদের জন্য স্থলের প্রানী শিকার হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ ইহরামে অবস্থায় থাকো। [মায়েদা/৯৬]

এখানে বিশেষভাবে স্থলের শিকার হারাম বলার মাধ্যমে সমুদ্রের প্রানী ইহরাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ প্রমানিত হয়।

<[৩২]> কেউ কেউ এটাকে মাফহুম (مفهوم) নামেও আখ্যায়িত করে থাকেন। উসূলবিদদের নিকট মাফহুম (مفهوم) দুই প্রকার,

ক . মাফহুম মুওয়াফিক (المفهوم الموافق)

খ . মাফহুম মুখালিফ (المفهوم المخالف)

মুওয়াফিক (موافق) অর্থ হলো সাদৃশ্যপূর্ণ আর (مخالف) অর্থ হলো বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। উভয়প্রকার মাফহুমের কাজ হলো বাক্যে উল্লেখ রয়েছে এমন বিধান দ্বারা বাক্যে উল্লেখ নেই এমন বস্তুর উপর বিধান কি তা নির্ণয় করা। বাক্যে যে বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে যদি সেই একই বিধান অন্য বস্তুর উপর প্রযোজ্য হবে এমন বোঝা যায় তবে সেটাকে মাফহুম মুওয়াফিক বলা হবে যেমন, আল্লাহর বাণী,

{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ২৩]

তোমরা পিতা মাতার উদ্দেশ্যে উফ্ শব্দ উচ্চারণ করো না। [ইসরা/২৩]

আয়াতে উফ শব্দ উচ্চারণ করতে ্িনষেধ করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে বোঝা যায় পিতামাতাকে গালি দেওয়া, মারধর করা ইত্যাদির বিধানও একই। এটাই হলো মাফহুম মুওয়াফিক (مفهوم موافق)। আমরা পূর্বে খাস শব্দের মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি (১১ নং টিকা দ্রষ্টব্য)। একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে আসলে মাফহুম মুওয়াফিক ও খাস শব্দের মাধ্যমে আম

ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। <[৩৩]> যেমন রসুলুল্লাহﷺবলেছেন,

---

উদ্দেশ্য করা উভয়ে একই জিনিসের দুটি নাম মাত্র। আর এ আলোচনা আমরা পূর্বেই সেরে নিয়েছি।

এখন মাফহুম মুখালিফ বলতে বোঝায় কোনো বাক্যে যে বিধান বর্ণিত আছে উক্ত বাক্যে উল্লেখ নেই এমন বস্তুর উপর তার বিপরীত বিধান প্রয়োগ হবে এমন বোঝা যাওয়া। ৩১ নং টিকাতে যা কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা এই পর্যায়েরই উদহারণ। লেখক এটাকেই দালীলুল খিতাব (دليل الخطاب) বলতে যা বোঝাচ্ছেন সেটাও এই একই জিনিস। উসুলের পরিভাষায় এটাকে মাফহুম (مفهوم) বা দালীলুল খিতাব (دليل الخطاب) নামে আখ্যায়িত করা হয়।

<[৩৩]> দালীলুল খিতাব (دليل الخطاب) বা মাফহুম (مفهوم) দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক ও বহু সংখক আলেমের মতে এটা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু হানীফা ও আহলে জাহিররা এটাকে দলীল হিসাবে মনে করেন না। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করলে পাঠকের নিকট সত্য প্রকাশিত হবে বলে আশা করি। তিন প্রকারের বাক্য হতে দালীলুল খিতাব পাওয়া যায়।

ক . কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট বা সিফাত (صفة) উল্লেখ করা। যেমন, মাঠে চরা ছাগলে যাকাত ফরজ বা ইহরাম অবস্থায় স্থলের প্রানী শিকার করা বৈধ নয় ইত্যাদি। এখানে ছাগলের সাথে মাঠে চরা বৈশিষ্ট উল্লেখ করার কারণে বাড়িয়ে খাওয়া ছাগলে যাকাত ফরজ না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আবার প্রানীর সাথে স্থল বৈশিষ্টটি যোগ করার কারণে ইহরাম অবস্থায় সমুদ্রের প্রানী শিকার করা বৈধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

খ . শর্ত যোগ করা। যেমন বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

{ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا} [آل عمران: ১২৫]

হ্যা (ফেরেস্তা আসবে) যদি তোমরা সবর করো ও আল্লাহকে ভয় করো। [আলে ইমরান/১২৫]

এই আয়াত থেকে সবর না করলে বা আল্লাহকে ভয় না করলে ফেরেস্তা আসবে না এমন বুঝা যায়।

গ . কোনো চুরান্ত সীমা নির্ধারন করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: ১৯৩]

তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [বাকারা/১৯৩]

এই আয়াত হতে দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া ও ফিতনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই এমন বোঝা যায়।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]

তোমাদের জন্য স্থলের প্রানী শিকার করা হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকো। [মায়েদা/৯৬]

এই আয়াতে ইহরাম ভেঙে ফেললে স্থলের প্রাণীও শিকার করা বৈধ প্রমানিত হয়।

এই সকল বিধানের উপর চিন্তা করলে দেখা যাবে দালীলুল খিতাব বা মাফহুম মুখালিফ অস্বীকার করাটা কখনও যৌক্তিক হবে পারে না। যারা এটি অস্বীকার করেন তারা বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপন করেন। যেমন,

আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]

উত্তম ভাবে ছাড়া তোমরা ইয়াতীমের মাল সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না। [আনয়াম/১৫২]

তারা বলেন, দালীলুল খিতাব গ্রহণ করলে এই আয়াত হতে ইয়াতীমের সম্পদ ছাড়া অন্যদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা বৈধ প্রমানিত হয়।

{فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦]

তোমরা হারাম মাসে একে অপরের উপর জুলুম করো না। [তাওবা/৩৬]

তারা বলেন, দালীলুল খিতাব গ্রহণ করলে হারাম মাস ছাড়া একে অপরের উপর জুলুম করা বৈধ প্রমানিত হয়।

ইবনে হিযাম এই প্রকারের বেশ কিছু আয়াত পেশ করে দালীলুল খিতাবকে খণ্ডায়ন করতে চেয়েছেন। তাদের অভিযোগের জবাব হলো,

সকল স্থানে দালীলুল খিতাব গ্রহণযোগ্য হবে না এটা সকলেই স্বীকার করে কিন্তু সকল স্থানে গ্রহণযোগ্য না হলেই যে সেটা কোনো স্থানেই দলীল হবে না এমন নয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে আমরের সীগা (صيغة الامر) সব সময় বাধ্যতামূলক প্রমাণ করে না বরং কখনও মুস্তাহাব বা বৈধ

প্রমান করার জন্য ব্যাবহৃত হয়। এ সত্ত্বেও আলেমদের বেশিরভাগের মতে সীগাতুল আমর হতে প্রথমত বাধ্যতামূলক বুঝতে হবে যতক্ষণ না ভিন্ন কোনো দলীল পাওয়া যায়। একই কথা এখানেও প্রযোজ্য অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় দালীলূল খিতাব দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ না তার বিপরীতে অধিক শক্ত দলীল পাওয়া যায়। উপরের দুটি আয়াতে যদি আমরা চিন্তা করি তবে দেখা যাবে ইয়াতীমের সম্পদ ছাড়া অন্যদের সম্পদও যে অন্যায় ভাবে গ্রহণ করা যাবে না সে বিষয়ে পৃথক দলীল রয়েছে। একইভাবে হারাম মাস ছাড়া অন্যান্য মাসেও যে কোনো মুসলিমের উপর জুলুম করা যাবে না সেটা অন্য দলীল দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমানিত। সূতরাং এই সকল আয়াতের উপর ভিত্তি করে দালীলুল খিতাববে পুরোপুরি অগ্রণযোগ্য সাব্যস্ত করাটা যৌক্তিক হতে পারে না।

যারা মাফহুম বা দালীলুল খিতাবকে দলীল বলেন তারা বেশ কিছু শর্ত উল্লেখ করে থাকেন। যেমন,

ক . দালীলুল খিতাবের মাধ্যমে যে বিধান প্রমানিত হচ্ছে তার বিপরীতে সরাসরি কোনো বিধান না থাকা। এর উদাহরণ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

খ . পূর্বের আলোচনাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, দালীলুল খিতাব তিনভাবে সৃষ্টি হয় (১) নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট বা সিফাত উল্লেখ করার কারণে (২) শর্ত উল্লেখ করার কারনে (৩) চুড়ান্ত সীমা উল্লেখ করার মাধ্যমে। যদি কোনো বাক্যে এই সকল বিষয়ের কোনো একটি উল্লেখ করা হয় তবে লক্ষ রাখতে হবে যে সেটা কি উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হচ্ছে। হতে পারে কোনো একটি ঘটনার কারণে বা, সমাজে অত্যাধিক প্রচলনের কারনে বাক্যে এই সকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী,

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: ٣٣]

তোমাদের দাসীরা যদি পবিত্র থাকতে চাই তবে তাদের জিনা করতে বাধ্য করো না [নুর/৩৩]

এখানে পবিত্র থাকতে চায় তবে তাদের বাধ্য করো না এই কথাটুকু অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে কারন আয়াতটি একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার কিছু দাসীকে জিনা করতে বাধ্য করতো আয়াতটি এই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে সেকারণে উক্ত ঘটনার সাথে মিল রেখে যদি তারা পবিত্র থাকতে চায় এই টুকু অতিরিক্ত বলা হয়েছে তাই এর দালীলুল খিতাব বা মাফহুম গ্রহণযোগ্য হবে না।

অন্য একটি আয়াতে পুরুষের জন্য কোন কোন নারীকে বিবাহ করা হারাম সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣]

আর তোমাদের স্ত্রীদের ঐ সকল মেয়েরা যারা তোমাদের কোলে পালিত হয়। [নিসা/২৩]

আলেমদের বৃহৎ অংশের মতে এখানে দালীলুল খিতাব গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ হিসাবে তারা বলেছেন স্ত্রীর কন্যা পরবর্তী স্বামীর গৃহে লালিত পালিত হওয়ার বিষয়টি আরব সমাজে অধিক প্রচলিত ছিল সেই জন্য বিষয়টিকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে কোলে পালত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তাই এর কোনো মাফহুম নেই।

সুতরাং দালীলুল খিতাবকে অস্বীকার করা নয় বরং শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করাটাই সঠিক মত।

## * মুতলাক (مطلق) ও মুকায়্যাদ (مقيد) এবং তাদের সাথে দালীলুল খিতাবের সম্পর্ক।

মুকায়্যাদ (مقيد) ও মুতলাক (مطلق) শব্দদুটি উসুলে ফিকহের পরিভাষা সমূহের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত। মুতলাক বলতে বোঝায় কোনো কিছু সাধারনভাবে বলা আর মুকায়্যাদ অর্থ হলো কোনো কিছু শর্তযুক্ত করে বলা। যেমন আল্লাহ বলেন,

{حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ .....} [البقرة: ١٧٣]

তোমাদের উপর মৃত জন্তু ও রক্ত ....হারাম করা হয়েছে। [বাকারা/১৭৩]

পরবর্তী একটি আয়াতে কি কি হারাম করা হয়েছে যে বিষয়ে বলা হয়েছে,

{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥]

অথবা প্রবাহিত রক্ত [আনয়াম/১৪৫]

এখানে প্রথম আয়াতে সাধারণভাবে রক্ত বলা হয়েছে দ্বিতীয় আয়াতে প্রবাহিত হওয়ার শর্ত যোগ করা হয়েছে। উসুলের পরিভাষায় প্রথম আয়াতটিকে মুতলাক (مطلق) আর দ্বিতীয় আয়াতটিকে মুকায়্যাদ (مقيد) বলা হয়।

এখানে প্রথম আয়াতটির সধারন অর্থকে দ্বিতীয় আয়াতটর মাধ্যমে সিমীত করার ব্যাপারে সসমস্ত আলেমরা একমত। [তাফসীরে কুরতুবী]

প্রথম আয়াতটির মাধ্যমে সকল রক্তই হারাম বলে প্রমনিত হয়। দ্বিতীয় আয়াটি না থাকলে গোশতের ভিতরে কাঠি প্রবেশ বা অন্য কোনো ভাবে প্রতি বিন্দু রক্ত পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক হতো। কিন্তু সূরা আনয়ামের আয়াত হতে বোঝা যায় সকল রক্ত নয় বরং শুধু প্রবাহিত রক্ত হারাম।

এখানে যা করা হয়েছে তা হলো সাধারণ অর্থের আয়াত বা মুতলাক (مطلق) কে সীমাবদ্ধ অর্থের

আয়াত বা মুকায়্যাদ (مقيد) এর মাধ্যমে সীমিত করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে উসুলের পরিভাষায় বলা হয়।

حمل المطلق علي المقيد

এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে আলেমরা কোনো দ্বিমত করেননি যেমন উপরের আয়াতটি আবার কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত করেছেন যেমন ওযুর আয়াতে কুনুই পর্যন্ত হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে আর তায়াম্মুমের আয়াতে সাধারনভাবে কেবল হাত মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন হাতের কবজী পর্যন্ত মাসেহ করা ফরজ আর কুনুই পর্যন্ত মাসেহ করা সুন্নাত আর অন্য একদল আলেম বলেছেন বরং হাতের কুনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

জিহারের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]

দাস মুক্ত করা। [মুজাদিলা/৩]

কোনো মুমিন ব্যাক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করার কাফ্ফারার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]

একজন মুমিন দাস মুক্ত করা [নিসা/৯২]

এখানে প্রথম আয়াতটি মুতলাক আর দ্বিতীয় আয়াতটি মুকায়্যাদ। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈর মতে জিহারের কাফ্ফারাতেও মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে যদিও উক্ত আয়াতে মুমিন শব্দটি উল্লেখ নেয়। তারা এখানে জিহারের আয়াতটিকে হত্যার কাফফারা সংক্রান্ত আয়াতটির শর্তের অধীন মনে করেছেন। অনেক আলেম অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটিকে আরেকটির সাথে মিলান নি। তারা জিহারের ক্ষেত্রে মুমিন দাস হওয়া শর্ত করেন নি।

মোট কথা যখন মুতলাক (مطلق) ও মুকায়্যাদ (مقيد) একই বিধানের ক্ষেত্রে আসে তখন মুতলাককে পরিত্যাগ করে মুকায়্যাদের উপর আমল করতে হবে এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই যেমন প্রবাহিত রক্ত সংক্রান্ত আয়াত দুটি যেহেতু উভয় আয়াতে একই বিধান তথা রক্ত হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তবে মুতলাক (مطلق) ও মুকায়্যাদ (مقيد) যখন ভিন্ন ভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে আসে তখন সেখানেও মুতলাক পরিত্যাগ করে মুকায়্যাদের উপর আমল করতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন জিহারের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে হয়েছে যেহেতু মুকায়্যাদ আয়াতটি হত্যার কাফ্ফারা সংক্রান্ত আর মুতলাক আয়াতটি জিহারের কাফফারা সংক্রান্ত সেকারনে কিছু কিছু আলেম

একটিকে আরেকটির সাথে মিলান নি।

এক্ষেত্রেও সঠিক মত হলো মুতলাককে পরিত্যাগ করে মুকায়্যাদের উপর আমল করা যদি না ভিন্ন কোনো দলীল পাওয়া যায়। যেমন তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে ওযুর আয়াতের বিধান অনুযায়ী কুনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করাই উচিত ছিল যদি না আম্মার ﷺ বর্নিত হাদীসটি পাওয়া যেতো যেখানে বলা হয়েছে।

ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ

তারপর তোমার মুখ ও দুই হাতের তালু মাসেহ করো [সহীহ মুসলিম]

এই হদীসের কারণে তায়াম্মুমের হাতের কবজি পর্যন্ত মাসেহ করা ফরজ হওয়ার মতটিই সঠিক কিন্তু যদি এই হাদীসটি না থাকতো তবে ওযুর বিধানের সাথে মিলিয়ে হাতের কুনুই পর্যন্ত মাসেহ করার মতটিই সঠিক হতো। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

এখন আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি,

আমরা পূর্বেই বলেছি যে দালীলুল খিতাব দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা এটাও জেনেছি যে মুতলাক ও মুকায়্যাদ যখন একই বিধানের ব্যাপারে আসে তখন মুতলাককে পরিত্যাগ করে মুকায়্যাদের উপর আমল করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। এখন আলেমরা যে বিষয়ে একমত হয়েছে সেটির মাধ্যমে আমরা দালীলুল খিতাবকে প্রমাণিত করতে পারি। ব্যাপারটি এই যে, আল্লাহ বলেছেন রক্ত হারাম। এখানে আম ভাবে সকল রক্তকে হারাম বলা হয়েছে। এই আয়াত অনুযায়ী সকল রক্তই হারাম। এই আয়াতের আম অর্থকে কোনো দলীল ছাড়া খাস করা যাবে না। অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে প্রবাহিত রক্ত হারাম। এই আয়াতটি হতে সকল আলেম মত দিয়েছেন যে উপরের আয়াতের আম অর্থকে এই আয়াত দ্বারা খাস করতে হবে। অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত ছাড়া অন্য রক্তকে হারাম বলা যাবে না। প্রবাহিত রক্ত ছাড়া অন্য রক্ত যে হারাম নয় এটা কিন্ত সূরা আনয়ামের ঐ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যেখানে বলা হয়েছে ,

{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ১৪৫]

অথবা প্রবাহিত রক্ত [আনয়াম/১৪৫]

এই আয়াতে প্রবাহিত রক্ত সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তা হারাম। আর সকল আলেমরা এই আয়াত হতে প্রমান করছেন যে প্রবাহিত রক্ত ছাড়া অন্য রক্ত হারাম নয়। তাহলে সকল আলেমরাই এই আয়াতের দালীলূল খিতাব বা (বিপরীত অর্থ) গ্রহণ করছেন। কিন্তু সমস্যা হলো ব্যাপারটি কেউ স্বীকার করেছেন আর কেউ স্বীকার করেন নি।

{في سائمة الغنم الزكاة}

## যে সব ছাগল মাঠে চরে বেড়ায় তাতে যাকাত আদায় করতে হবে

কেউ কেউ <[৩৪]> এ থেকে এমন বুঝেছেন যে যেসব পশু বাড়িতে খাওয়ানো হয় তাতে যাকাত ফরজ হবে না। <[৩৫]>

وَأَمَّا الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ إِلْحَاقُ الْحُكْمِ الْوَاجِبِ لِشَيْءٍ مَا بِالشَّرْعِ بِالشَّيْءِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِشَبَهِهِ بِالشَّيْءِ الَّذِي أَوْجَبَ الشَّرْعُ لَهُ ذَلِكَ الْحُكْمَ أَوْ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا، وَلِذَلِكَ كَانَ الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ صِنْفَيْنِ: قِيَاسَ شَبَهٍ،

---

**এক কথায় মুকায়্যাদের খাস অর্থের উপর নির্ভর করে মুতালাকের আম অর্থকে পরিত্যাগ করা আর মুকায়্যাদের দালীলুল খিতাব (دليل الخطاب) বা মাফহুম মুখালিফ (مفهوم مخالف) গ্রহণ করা একই কথা।**

এ থেকে আরো একটি গুরুত্বপুর্ণ নীতিমালা বের হয়ে আসে তা হলো,

**দালীলুল খিতাবের মাধ্যমে আমকে খাস করা যায়। একটু চিন্তা করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।**

<[৩৪]> যদিও লেখক এখানে কেউ কেউ শব্দ ব্যাবহার করেছেন কিন্তু জমহুর আলেমের মত হলো গৃহে খাওয়ানো পশুতে যাকাত নেই। তবে মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত ভিন্ন।

<[৩৫]> মৌখিকভাবে শরীয়তের যেসব বিধিবিধান জানা যায় সে সম্পর্কিত আলোচনা এখানেই শেষ। এর পর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা শুরু হবে। লেখক চারটি বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন ভিন্ন আরেকটি বিষয় রয়েছে যা অন্যান্য আলেমরা আলোচনা করেছেন। উসুলের পরিভাষায় সেই বিষয়টিকে তা'রীদ (التعريض) বলা হয়। অর্থাৎ কোনো কিছু সরাসরি না বলে অন্য কোনো শব্দের মাধ্যমে সেদিকে ইঙ্গিত করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

{وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا} [التوبة: ٨١]

মুনাফিকরা বলে তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না আপনি বলুন জাহান্নামের আগুণ অধিক উত্তপ্ত। [তাওবা/৭১]

আয়াতের বলা হয়েছে জাহান্নামের আগুণ অধিক উত্তপ্ত এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য এটা প্রমান করা যে জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে জাহান্নামী হতে হবে। চিন্তা করলে দেখা যাবে এটি লেখকের উল্লেখিত চারটি প্রকার হতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র।

আর শরীয়তের দৃষ্টিতে কিয়াস <[৩৬]> হলো যে বিষয়ে শরীয়তের বিধান নেই সেই বিষয়কে শরীয়তের বিধান রয়েছে এমন কোনো বিষয়ের সাথে যুক্ত করা। যখন উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা একই কারণ বিদ্যামান থাকে। একারণে শরীয়তে কিয়াস দুই প্রকার <[৩৭]> (১) কিয়াসে শুবহাত (قياس شبهة) সাদৃশ্যগত কিয়াস। (২) কিয়াসে ইল্লাত (قياس علة) বা কারণগত কিয়াস। <[৩৮]>

---

<[৩৬]> কিয়াসকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. কিয়াসে তরদ (قياس طرد)

খ . কিয়াসে আকস (قياس عكس)

কিয়াসে তরদ হলো দুটি জিসিসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারনে বা একই কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে উভয়ের উপর শরীয়তের একই বিধান প্রযোজ্য বলে মনে করা।

আর কিয়াসে আকস হলো দুটি জিনিসের মধ্যে অমিল ও বৈশাদৃশ্য থাকার কারণে উভয়ের উপর শরীয়তের একই বিধান প্রযোজ্য নয় এমন মনে করা।

উভয় প্রকারের উদাহরণ নিচে বর্ণনা করা হবে ইন শাআল্লাহ।

<[৩৭]> লেখক এখানে কিয়াসে তরদের কথা বলছেন। অর্থাৎ লেখকের মতে কিয়াসে তরদ দুই প্রকার তবে কেউ কেউ বলেছে তিন প্রকার। তরা লেখকের উল্লেখিত দুটি প্রকারের সাথে কিয়সে দালালাত (قياس دلالة) নামের আর একটি কিয়াসের কথা বলেছেন। তবে কিয়াসে দালালাতকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। একারণে লেখক কিয়াসকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

<[৩৮]> যেমন ওযুর সময় একবারের অধিক মাথা মাসেহ করা সুন্নাত না হওয়ার উপর কিয়াস করে মোজার উপর মাসেহ করার সময় একের অধিক না করার রায় দেওয়া। কেননা এখানে কেবল বাহ্যিক সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে মাসেহ করার প্রকৃত কারণ কি তা জানা যায় নি। একইভাবে যারা সমুদ্রের ঐ সকল প্রাণীকে হারাম বলেছেন যেগুলো স্থলের কোনো প্রাণীর সাথে সাদৃশ্য রাখে যেমন পানীর শুকর (خنزير الماء) ইত্যাদি। এক কথায় শুধু মাত্র বাহ্যিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে দুটি বস্তুর উপর একই বিধান কার্যকর করাকে কিয়াসে শুবহাত (قياس الشبهة) বলা হয়।

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ وَاللَّفْظِ الْخَاصِّ يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ: أَنَّ الْقِيَاسَ يَكُونُ عَلَى الْخَاصِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ، فَيُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، أَعْنِي أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ يُلْحَقُ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّبَهِ الَّذِي بَيْنَهُمَا، لَا مِنْ جِهَةِ

---

যেমন মদের সাথে কিয়াস করে অন্যান্য নেশা দ্রব্যকে হারাম বলা। এখানে মদের সাথে গঠন বা আকার আকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও শুধু মাত্র নেশা দ্রব্য হওয়ার কারণে কোনো কিছুকে হারাম বলা হবে। কোনো বস্তুর উপর কি কারণে বিধান জারি করা হলো তা বুঝতে পারলে উক্ত কারণ যার মধ্যেই পাওয়া যাবে তার উপর উক্ত বিধান জারি করা হবে। এটাকেই কিয়াসে ইল্লাত (قياس علة) বলা হয়।

কিয়াসে ইল্লাত ও কিয়াসে শুবহাতের মধ্যে পার্থক্য হলো যখন দুটি বস্তুর মাঝে শুধু মাত্র বাহ্যিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে উভয়ের উপর একই বিধান প্রযোজ্য করা হয় তখন সেটাকে কিয়াসে শুবহাত বলা হয় আর যখন বাহ্যিাক সাদৃশ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে কোনো একটি আভ্যন্তরীন কারণের উপর নির্ভর করে উভয়ের উপর একই বিধান প্রযোজ্য করা হয় তখন সেটাকে কিয়সে ইল্লাত বলে।

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে কিয়াস প্রধানত দুই প্রকার। (১) কিয়াসে তরদ (২) কিয়াসে আকস। দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো মিল থাকার কারণে উভয়ের উপর একই বিধান প্রয়োগ করাকে কিয়াসে তরদ বলে আর দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো অমিল থাকার কারণে উভয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রয়োগ করাকে কিয়াসে আকস বলে। লেখক শুধুমাত্র কিয়াসে তরদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিয়াসে আকসের উদাহরণ হলো,

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও সাদকা সরুপ। [মুসলিম]

এ কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম অবাক হলে রসুলূল্লাহ ﷺ বললেন। যখন কেউ জিনা করে তখন কি তার পাপ লেখা হয়? সাহাবায়ে কিরাম সম্মতি জানালে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, একইভাবে যখন সে এটা হালাল পন্থায় পূর্ণ করে তার পুরষ্কার দেওয়া হয়।

এখানে জিনার সাথে স্ত্রী সহবাসের যে অমিল সে কারণে উভয়ের উপর বিপরীত বিধান জারি করা হয়েছে।

বিতরের সলত বাহনের উপর বসে আদায় করা যায়। এ থেকে আলেমরা বলেছেন বেতরের সলাত ফরজ নয়। যেহেতু ফরজ সলাত বাহনের উপর বসে আদায় করা যায় না।

এখানেও উভয়ের মধ্যে যে অমিল রয়েছে সে কারণে উভয়ের উপর বিপরীত বিধান জারি করা হচ্ছে।

دَلَالَةِ اللَّفْظِ، لِأَنَّ إِلْحَاقَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ مِنْ جِهَةِ تَنْبِيهِ اللَّفْظِ لَيْسَ بِقِيَاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ يَتَقَارَبَانِ جِدًّا، لِأَنَّهُمَا إِلْحَاقٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ بِمَنْطُوقٍ بِهِ، وَهُمَا يَلْتَبِسَانِ عَلَى الْفُقَهَاءِ كَثِيرًا جِدًّا.

فَمِثَالُ الْقِيَاسِ: إِلْحَاقُ شَارِبِ الْخَمْرِ بِالْقَاذِفِ فِي الْحَدِّ، وَالصَّدَاقِ بِالنِّصَابِ فِي الْقَطْعِ، وَأَمَّا إِلْحَاقُ الرِّبَوِيَّاتِ بِالْمُقْتَاتِ أَوْ بِالْمَكِيلِ أَوْ بِالْمَطْعُومِ، فَمِنْ بَابِ الْخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ الْعَامُّ، فَتَأَمَّلْ هَذَا، فَإِنَّ فِيهِ غُمُوضًا.

وَالْجِنْسُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لِلظَّاهِرِيَّةِ أَنْ تُنَازِعَ فِيهِ، وَأَمَّا الثَّانِي، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُنَازِعَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ السَّمْعِ، وَالَّذِي يَرُدُّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَوْعًا مِنْ خِطَابِ الْعَرَبِ.

কিয়াসের সাথে খাস শব্দ দ্বারা আম উদ্দেশ্য করার পার্থক্য হলো <[৩৯]> যে খাস শব্দ দ্বারা খাসই উদ্দেশ্য করা হয়েছে কিয়াস সেখানে প্রযোজ্য হয় কিয়াসের মাধ্যমে তার সাথে অন্য বিষয়কে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ে শরীয়তে কোনো বিধান বর্ণিত হয়নি সেটাকে যে বিষয়ে বিধান বর্ণিত হয়েছে তার সাথে যুক্ত করা। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে এমনটি করা হয় এ কারণে নয় যে মূল শব্দটিই কোনোভাবে উক্ত বিষয়ের উপর ইঙ্গিত করে। কেননা মূল শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে কোনো বিষয়কে শরীয়তে বর্ণিত কোনো বিধানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করাকে কিয়াস বলা হয় না। এটাতো উক্ত শব্দেরই একটি অর্থ। <[৪০]> এই দুটি বিষয়ের মধ্যে অত্যাধিক সাদৃশ্য

---

<[৩৯]> লেখক এখানে কিয়াস (قياس) ও খাস শব্দের মাধ্যমে আম উদ্দেশ করার (خاص اريد به العام) মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করছেন। পূর্বে আমরা কিয়াসের অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। খাস শব্দ দ্বারা আম উদ্দেশ্য হওয়া বলতে কি বোঝায় সেটাও আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন "তোমরা পিতামাতার উদ্দেশ্যে উফ্ শব্দ উচ্চারণ করো না" এখানে খাস শব্দের মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু এখানে শুধু উফ্ উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়নি বরং সেই সাথে মারধর করা বা গালি দেওয়াকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

<[৪০]> যে খাস শব্দের মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেখানে কিয়াসের প্রয়োজন নেই বরং উক্ত শব্দে আম অর্থের মাধ্যমেই কোনো বস্তুকে উক্ত বিধানের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত করা যাবে। যেমন উপরের টিকাতে যে আয়াতটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে পিতামাতাকে মারধর করা বা গালি দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি কিয়াসের মাধ্যমে নয় বরং উফ শব্দ হতে যে ব্যাপাক অর্থ বোঝা

রয়েছে কেননা উভয় ক্ষেত্রেই বর্নিত নেই এমন বিষয়কে বর্ণিত আছে এমন বিষয়ের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। <[৪১]> এই বিষয়দুটিতে ফকীহগণ ভীষণ জটিলতার শিকার হন। <[৪২]>

কিয়াসের উদাহরণ হলো মদ্যপায়ীকে শাস্তির ব্যাপারে সতি নারীর প্রতি অপবাদ দানকারীর সাথে সম্পৃক্ত করা <[৪৩]> এবং মেয়েদের সর্বনিম্ন দেন মোহর কত হবে তা

---

গেছে তা থেকেই প্রমাণিত। কিয়াসের প্রয়োজন  কেবল তখন হবে যখন মূল শব্দটির অর্থের মধ্যে কোনোভাবেই বিষয়টি অন্তভূর্ক্ত না হয়। যেমন সতি নারীর প্রতি অববাদ দান কারীর শাস্তির উপর কিয়াস করে মাদপান কারীর শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা। কেননা যে আয়াতে অপবাদ দান কারীর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে সেই আয়াতের অর্থের মধ্যে কোনোক্রমেই মদপানকারীকে প্রবেশ করানো যায় না। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম কিয়াসের মাধ্যমে মদপানকারীর জন্য উক্ত শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আসবে ইনশা আল্লাহ।

<[৪১]> কিয়াসের মাধ্যমেও উল্লেখ নেই এমন বস্তুকে উল্লেখ আছে এমন বস্তুর বিধানে অন্তভূর্ক্ত করা হয় আবার খাস শব্দের আম অর্থ করার মাধ্যমেই উল্লেখ নেই এমন বস্তুকে উক্ত বিধানের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত করা হয়। এই কারণে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। পার্থক্য করার খুব বেশি প্রয়োজনও নেই যেহেতু জমহুর আলেমের নিকট উভয়ের বিধান একই। কিন্তু যারা কিয়াসকে অস্বীকার করে তাদের জন্য পার্থক্য জানা জরুরী তা না হলে অনেক ক্ষেত্রে খাস শব্দের আম অর্থকে কিয়াস মনে করে অস্বীকার করে বসতে পারে। মূলত তাদের উদ্দেশ্যেই লেখক এই আলোচনার অবতারনা করেছেন যা পরবর্তীতে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

<[৪২]> অনেকেই কিয়াস শব্দটি খাস শব্দের আম অর্থের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন কেউ কেউ বলেন উফ্ শব্দটির উপর কিয়াস করে মারধর করা বা গালি দেওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এখানে কিয়াস নয় বরং মূল বাক্যটির আম অর্থের মধ্যেই মারধর বা গালিগালাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

<[৪৩]> সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ এর সময় মদ্যপায়ীকে জুতা সেন্ডেল বা খেজুরের ডাল দ্বারা প্রহার করা হতো। আবু বকর ﷺ এর সময় ৪০ বেত মারা হতো। উমর ﷺ সাহাবাদের একত্রিত করে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন,

أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ

যতটুকু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয় তার সাথে সম্পৃক্ত করা। <[৪৪]> কিন্তু যে সকল বস্তুতে সুদ প্রযোজ্য হয় <[৪৫]> সেগুলোর সাথে প্রধান খাবার সমূহ বা ওযন

---

(কোরানে বর্ণিত)সর্ব নিম্ন শাস্তি হলো ৮০ বেত্রাঘাত। [সহীহ মুসলিম]

উমর ﷺ এই শাস্তিটিই চালু করেন।

এখানে সতি নারীকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি তথা ৮০ বেত্রাঘাত হতে কিয়াস করে মদ্যপায়ীর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু সতী নারীকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে যে আয়াত এসেছে তার অর্থের মধ্যে কোনোভাবেই মদ পান করার ব্যাপারটি অন্তর্ভূক্ত নয় তাই এটা কিয়াস বলে গণ্য।

<[৪৪]> বিবাহের সময় সর্বনিম্ন কতো দেনমোহর ধার্য করা যায় সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইত্যাদি আলেমদের মতে মোহরের সর্ব নিম্ন কোনো পরিমান নেই। তবে কিছু আলেম সর্ব নিম্ন যতটুকু চুরি করলে চোরের হাত কাটা বৈধ হয় সেই পরিমানকে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই হিসাবে ইমাম মালিক বলেছেন এক দিনারের চার ভাগের একভাগ যেহেতু তার নিকট এই পরিমান চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে আর ইমাম আবু হানীফা বলেছেন ১০ দিরহাম যেতে তার নিকট এই পরিমানে চোরের হাত কাটা বৈধ হয়। এটিও কিয়াসেরই উদাহরণ যদিও এই কিয়াসটি দূর্বল। এই বয়ের বিবাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে লেখক এই মতটিকে দূর্বল বলেছেন ও কিয়াসটিকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

<[৪৫]>রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ

তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা, রোপার বিনিময়ে রোপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান এবং নগতে ছাড়া বিক্রয় করো না।

যদি কেউ এক কেজি দামী খেজুরের মাধ্যমে ২ কেজি কম দামের খেজুর ক্রয় করতে চান তবে তা বৈধ হবে না বরং সমান সমান হতে হবে। আবার যদি কেউ এক কেজি খেজুরের বিনিময়ে বাকিতে এক কেজি খেজুর ক্রয় করতে চান তবু বৈধ হবে না বরং নগতে ক্রয় করতে হবে। একথা হাদীসে উল্লেখিত ছয়টি প্রকারের উপর প্রযোজ্য অর্থাৎ এগুলো সর্বদা নগতে ও সমান সমানভাবে ক্রয় করতে হবে। তবে খেজুরে সাথে গম বা সোনার সাথে রোপা বেশি কম ক্রয় করলে দোষ নেয় যদি নগতে ক্রয় করা হয়। এর ব্যাতিক্রম করলে সুদ বলে গণ্য হবে। তাই এই ছয়টি পণ্যকে আমওয়ালে রাবাবী (الاموال الربوية) বলা হয়। অর্থাৎ সুদ প্রযোজ্য হয় এমন পন্য।

করা হয় ও পরিমাপ করাহয় এমন বস্তুসমূহকে যোগ করাটা কিয়াস নয় বরং খাস শব্দের মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য করা। <[৪৬]> এ বিষয়ে চিন্তা করো কেননা এখানে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। <[৪৭]>

আহলে জাহেররা প্রথম প্রকারটিকে অস্বীকার করতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপারে তাদের কোনোরুপ ভিন্ন মত রাখা উচিত নয় কেননা এটা ভাষার একটি অংশ আর যে এটাকে অস্বীকার করে সে আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি বাচনভঙ্গিকেই অস্বীকার করে। <[৪৮]>

---

<[৪৬]> হাদীসে ছয়টি পণ্যকে আমওয়ালে রাবাবী (الاموال الربوية) হিসাবে উল্লেক করা হয়েছে। আহলে জাহিররা এর সাথে আর কিছুই বাড়তি যোগ করেনি কিন্তু জমহুর আলেম ও চার ইমাম একমত হয়েছেন যে হাদীসে ছয়টি পণ্য উল্লেখ করা হয়েছে তবে ছয়টিই উদ্দেশ্য নয় বরং এই ছয়টি উল্লেখের মাধ্যমে এর সাথে সামাঞ্জস্য রাখে এমন সকল পন্যকেউ বোঝানো হয়েছে। এক তারা একমত হয়েছেন যে একানে খাসভাবে ছয়টির কথা উল্লেখ করা হলেও এর খাস অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং এর অর্থের মধ্যে ছয়টির বাইরে আরো অনেক পণ্য আমভাবে অন্তর্ভূক্ত হবে। ফলে আলেমরা এই ছয়টি ছাড়াও বহু পণ্যকে আমওয়ালে রাবাবী বলে চিহ্নিত করেছেন হাদীসে সরাসরি যার উল্লেখ নেই। তবে এটাকে কিয়াস বলা যাবে না কারণ সরসরি উল্লেখ না থাকলেও এগুলো হাদীসটির আম অর্থের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত। কিয়াস কেবল তখন বলা যাবে যখন কোনো কিছু কোনো ভাবেই মূল বিধানটির অর্থের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত না হয় যারা উদাহরণ আমরা উপরে দেখেছি।

<[৪৭]> যারা কিয়াসকে স্বীকার করে না তাদের জন্য এই পার্থক্য জানা জরুরী তা না হলে আম অর্থকে অস্বীকার করে বসতে পারেন কিন্ত যারা কিয়াসকে স্বীকার করেন তাদের নিকট উভয়ের বিধানই সমান তাই পার্থক্য করতে পারা বা না পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না।

<[৪৮]> এদের উদ্দেশ্যেই মূলত এই আলোচনা করা হয়েছে। যদি কেউ বলে পিতা মাতার উদ্দেশ্যে উফ্ শব্দ উচ্চারণ করো না এই আয়াতের মাধ্যমে মারধর করা হারাম প্রমাণিত হয়না তবে সে আরবী ভাষার একটি অংশকে অস্বীকার করলো যেহেতু আরবী ভাষাতে এভাবে একটি শব্দের মাধ্যমে আমভাবে অনেক অর্থ উদ্দেশ্য করার প্রচলন রয়েছে। আরবী ভাষাকে অস্বীকার করে কোরআনের বিধান বুঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ কোরআন সম্পর্কে বলেন,

{وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: ١٠٣]

وَأَمَّا الْفِعْلُ: فَإِنَّهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي تُتَلَقَّى مِنْهَا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَقَالَ قَوْمٌ: الْأَفْعَالُ لَيْسَتْ تُفِيدُ حُكْمًا إِذْ لَيْسَ لَهَا صِيَغٌ، وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهَا تُتَلَقَّى مِنْهَا الْأَحْكَامُ اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِ الْحُكْمِ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ قَوْمٌ: تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَقَالَ قَوْمٌ: تَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهَا إِنْ أَتَتْ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ دَلَّتْ عَلَى الْوُجُوبِ، وَإِنْ أَتَتْ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ مَنْدُوبٍ إِلَيْهِ دَلَّتْ عَلَى النَّدْبِ ; وَإِنْ لَمْ تَأْتِ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْقُرْبَةِ دَلَّتْ عَلَى النَّدْبِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحَاتِ دَلَّتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ

বেশিরভাগের মতে (রসুলুল্লাহ ﷺ এর) কাজসমূহ <[৪৯]> শরীয়তের বিধান অবগত হওয়ার একটি মাথ্যম কেউ কেউ বলেছে কাজের মাধ্যমে কোনো বিধান প্রমানিত হয় না যেহেতু এর কোনো নির্দিষ্ট রুপ নেই। <[৫০]> যারা বলেন কাজের মাধ্যমে বিধান

---

আর এটা তো স্পষ্ট আরবী ভাষা [নাহল/১০৩]

সূতরাং আরবরা যেসব বাচণভঙ্গি ব্যাবহার করতো সেগুলোকে অস্বীকার করলে কোরানের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা অসম্ভব। খাসের মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য করা আরবদের বাচনভঙ্গির মধ্যে অন্তভূর্ক্ত তাই এই বিষয়টিকে অস্বীকার করা যাবে না।

<[৪৯]> শরীয়তের বিধিবিধান সমূহ আল্লাহর রসুলের নিকট হতে যে তিনটি মাধ্যমে অর্জিত হয় তার প্রথম প্রকার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে এখন দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ আল্লাহর রসুলের যে সব কাজ করেছেন সেগুলোর মাধ্যমে কিভাবে বিধান প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

<[৫০]> এই মতটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। একটি হাদীসে এসেছে তিনজন ব্যাক্তি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। তাদের একজন বলল আমি কখনও বিবাহ করবো না অন্যজন বলল আমি সারারাত সলাত আদায় করবো কখনও ঘুমাবো না শেষের জন বলল আমি সর্বদা সওম পালন করবো। রসুলুল্লাহ ﷺ এসব শুনে বললেন,

أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

আল্লাহর কসম আমিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি আল্লাহকে ভয় করি কিন্তু আমি কখনও সওম পালন করি কখনও ভঙ্গ করি, রাতের কিছু অংশ সলাত আদায় করি আর কিছু অংশ ঘুমায় এবং বিবাহ করি অতএব যে কেউ আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। [সহীহ বুখারী]

প্রমানিত হবে তারা দ্বিমত করেছেন যে এর মাধ্যমে কি ধরণের বিধান প্রমানিত হবে। কেউ বলেছেন আল্লাহর রসুল কোনো কাজ করেছেন এ থেকে উক্ত কাজটি ফরজ হওয়া প্রমানিত হবে <[৫১]> অন্য একদল লোক বলেছেন না বরং মুস্তাহাব প্রমানিত

---

এভাবে বিভিন্ন প্রশ্নে উত্তরে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আমি এটা করি এর মাধ্যমে প্রশ্ন কর্তাকে উক্ত কাজটি বৈধ হওয়ার বিষয়ে অবহিত করেছেন।

এসকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রসুলের কাজসমূহ হুজ্জাত (حجة) বা দলীল।

<[৫১]> মালেকী ও শাফেঈ মাযহাবের কোনো কোনো আলেম বলেছেন আল্লাহর রসুল কোনো কিছু করেছেন এ থেকে উক্ত কাজটি ফরজ বলে প্রমানিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন কথার থেকে কাজের মাধ্যমেই বেশি শক্ত প্রমান পাওয়া যায়। তারা বুখারী বর্ণিত একটি হাদীস হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর রসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا

তোমরা সকলে ওঠো, কুরবানী করো এবং মাথার চুল কেটে ফেলো।

তিনি তিন বার একথা বলার পরও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ উঠলেন না। উম্মে সালামা ﷺ কে একথা বললে তিনি বললেন আপনি কি এমনটিই চাচ্ছেন? তাহলে এক কাজ করুন, কারো সাথে কোনো কথা বলবেন না নিজের বাইরে গিয়ে নিজের উট কুরবানী করুন এবং নাপিতকে ডেকে আপনার চুল কেটে ফেলুন। পরে তিনি তাই করলেন তখন সকল সাহাবারা তাড়াহুড়া করে নিজেদের উট কুরবানী করতে শুরু করলেন এবং চুল কাটতে লাগলেন।

তারা এই হাদীস হতে কথাকে কাজের তুলনায় বেশি শক্ত দলীল মনে করে থাকেন। কিন্তু তাদের এই দলীল গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এই ঘটনাতে রসুলূল্লাহ ﷺ প্রথমে যে আদেশ দিয়েছিলেন সেটির কারণেই কাজটি ফরজ বাধ্যতামুলক হয়েছিল আর যারা এটা অমাণ্য করেছেন তারা আল্লাহর রসুলের আদেশ অমান্য করেছেন ও পাপী হয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে যেমন যেসকল সাহাবারা উহুদ যুদ্ধ হতে পালিয়ে এসেছিলেন তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছি। মোট কথা আল্লাহর রসুলের কথার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামের আমল কখনও দলীল হতে পারে না। পরবর্তীতে আল্লাহর রসুল ﷺ কে উট কুরবানী ও চুল কেটে ফেলতে দেখে তরা তাড়াহুড়া করে তা করতে শুরু করেন কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রথমে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করতে বিলম্ব করে তারা অপরাধ করেছেন। যদি রসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে কিছুই না বলতেন বরং শুধু নিজে উট কুরবানী

হবে। <[৫২]> তবে দক্ষ আলেমগণের মতে যদি কাজের মাধ্যমে এমন কোনো মুজমালের <[৫৩]> ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যা নিজে ওয়াজিব তবে উক্ত কাজটিও ওয়াজিব বলে গণ্য হবে আর যদি কোনো মুস্তাহাব মুজমালের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তবে উক্ত কাজটিও মুস্তাহাব হবে। <[৫৪]> যদি কোনো মুজমালের ব্যাখ্যা হিসাবে না এসে থাকে

---

করতেন ও চুল কাটতেন তবে বিষয়টি এমন গুরত্ব পেতো না। একটু চিন্তা করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

<[৫২]> যারা বলেছেন আল্লাহর রসুলের কাজের মাধ্যমে কখনই কোনো কিছু ফরজ প্রমাণিত হবে না বরং সব সময় মুস্তাহাব প্রমাণিত হবে তাদের কথাও সঠিক নয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা আসছে ইনশ আল্লাহ।

<[৫৩]> আল্লাহ বা তার রসুলের পক্ষ হতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত কেবল ভাষার উপর চিন্তাভাবনা করে যে শব্দের অর্থ বোঝা সম্ভব হয় না সেটাকে উসুলের পরিভাষায় মুজমাল (مجمل) বলে। যেমন সলাত, সওম, যাকাত ইত্যাদি। ২৪ নং টিকাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

<[৫৪]> যেমন সলাত একটি মুজমাল শব্দ যা নিজে ফরজ। এখন রসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করেছেন তা সলাতের ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য হবে। সলাতে রসুলূল্লাহ ﷺ যা কিছু করেছেন তা ফরজ বলে গণ্য হবে যদি না এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি কখনও তা করেছেন আর কখনও ছেড়েছেন। একারণে আলেমরা সকলে একমত যে সলাতের শেষ বৈঠকে বসা ফরজ যদিও সে বিষয়ে আল্লাহর রসুলেল কোনো নির্দেশ বিদ্যমান নেই। এমভাবে কোনো মুজমাল যদি নিজে মুস্তাহাব হয় তবে তার ব্যাখ্যায় রসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করবেন তা মুস্তাহাব বলে প্রমানিত হবে।

এছাড়া আরেকটি বিষয় রয়েছে। যেসব ইশারা বা ইঙ্গিত মুখের কথার পরিবর্তে ব্যবাহৃত হয় সেগুলোর মাধ্যমে যা বোঝা যাবে সেই অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে। যেমন উপরে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে রসুলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ﷺ এর উদ্দেশ্যে ইশারা করেন তার মাধ্যমে তাকে যথা স্থানে স্থীর থাকতে বলেন। পরে তিনি আবু বকর ﷺ কে বলেন,

يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك

হে আবু বকর আমি তোমাকে আদেশ করার পরও তুমি কেনো স্থীর থাকলে না? [বুখারী ও মুসলিম]

এখানে হাতের ইশারাকে আদেশ বলে উল্লেক করা হয়েছে। সুতরাং এমন অর্থপূর্ণ আকার ইঙ্গিতকে

তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি করার মাধ্যম হিসাবে এসে থাকলে তা মুস্তাহাব প্রমাণিত হবে আর যদি (বৈষয়িক) বৈধ কাজ সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে তবে তা বৈধ বলে গণ্য হবে। <[৫৫]>

وَأَمَّا الْإِقْرَارُ: فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ

আর (আল্লাহর রসুল ﷺ এর পক্ষ হতে কোনো কাজের প্রতি) সম্মতি শুধু মাত্র উক্ত কাজটি বৈধ হওয়া প্রমাণ করে। <[৫৬]>

---

যদিও মুলত কাজ কিন্তু এগুলো কথার ভুমিকা পালন করবে।

<[৫৫]> কোনো মুজমালের ব্যাখ্যাসরুপ নয় বরং সাধারণভাবে যেসব কাজ রসুলুল্লাহ ﷺ করেছেন সেগুলো দুই প্রকার,

ক . যেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার মাধ্যম বা দ্বীন হিসাবে আদায় করেছেন। এইসকল কাজকে কুরাবা (قربة) , ইবাদা (عبادة) তয়া (طاعة) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যেমন নফল সলাত, সওম, দোয়া ইত্যাদি।

খ . যেগুলো মানবীয় অভ্যাস হিসাবে করেছেন। যেমন ঘুমানো, খাওয়া, ইত্যাদি। এগুলোকে আদত (عادة) বলে।

প্রথম প্রকারের কাজটি মুস্তাহাব অর্থাৎ করলে সওয়াব না করলে পাপ নেই আর পরের প্রকারটি মুবাহ বা বৈধ অর্থাৎ তা করা বা না করাতে সওয়াব বা পাপের কোনো প্রশ্ন নেই।

<[৫৬]> আল্লাহর রসুল ﷺ এর মাধ্যমে যেসব পদ্ধতি ও পন্থায় শরীয়তের বিধিবিধান জানা যায় তার শেষ প্রকারটি হলো সম্মতি প্রদান। এখানে লেখক সে বিষয়ে আলোচনা করছেন। আল্লাহর রসুলের সামনে যখন কোনো কিছু ঘটে আর তিনি নিরব থাকেন তখন উক্ত কাজটি বৈধ বলে প্রমাণিত হয়। যেমন রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে গুইসাপের মাংস খান নি কিন্তু তার সামনে খাওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,

ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم

যদি এটা হারাম হতো তবে আল্লাহর রসুলের বিছানায় তা খাওয়া হতো না। [সহীহ বুখারী]

সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে কোনো কাজ কেবল বৈধ প্রমানিত হয়। সেটা মুস্তাহাব বা ফরজ প্রমাণিত হয়

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى أَحَدِ هَذِهِ الطُّرُقِ الْأَرْبَعَةِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَطْعِيًّا، نَقَلَ الْحُكْمَ مِنْ غَلَبَةِ الظَّنِّ إِلَى الْقَطْعِ. وَلَيْسَ الْإِجْمَاعُ أَصْلًا مُسْتَقِلًّا بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ يَقْتَضِي إِثْبَاتَ شَرْعٍ زَائِدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ مِنَ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ

আর ইজমা <[৫৭]> এই চারটি বিষয়ের <[৫৮]> কোনো একটির সাথে সম্পর্কিত। <[৫৯]>

---

না।

<[৫৭]> ইজমা (إجماع) বলতে বোঝায় কোনো এক যুগের সকল আলেমদের ঐক্যমত। এটা শরীয়তের অকাট্য দলীল সমূহের একটি। ইজমা শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। ইমাম শাফেঈকে একবার একজন প্রশ্ন করে ইজমা যে শরীয়তের দলীল তার প্রমাণ কি? ইমাম শাফেঈ একটি কোরনের একটি আয়াত থেকে তার উত্তর দেন। আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ১১৫]

যে কেউ তার নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করে সে যে পথ গ্রহণ করে আমি তাকে সেই পথেই ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো তা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। [নিসা/১১৫]

আয়াতে রসুলের বিরোধিতা করার সাথে সাথে মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ গ্রহণ করাকে জাহান্নামী হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ উক্ত লোককে বলেন,

لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض

এটা যদি ফরজ নাই হবে তবে মুমিনদের বিরোধিতা করার কারণে জাহান্নামে দেওয়া হবে কোনো?

[মিফতাহুল জান্না সুয়ুতী]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

আল্লাহ আমার উম্মতকে ভ্রান্তির উপর একত্রিত করবেন না। [তিরমিযী]

আলেমরা বলেছেন এটা একটি কারামত যা আল্লাহ এই উম্মতকে দান করেছেন। অর্থাৎ কেনো এটা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে তা যুক্তির মাধ্যমে বোধগম্য নাও হতে পারে।

ইজমা দুইভাবে সম্পন্ন হতে পারে

১ . কোনো বিষয়ে গ্রহনযোগ্য আলেম মুজতাহিদদের সকলের প্রতক্ষ মতামত বা আমল পাওয়া যাওয়া।

২ . কোনো বিষয়ে একদল মুজতাহিদ হতে আমল বর্ণিত হওয়া আর অন্য কারো পক্ষ হতে দ্বিমত পাওয়া না যাওয়া।

জমহুর আলেমের নিকট উভয় প্রকার ইজমাই দলীল হিসাবে গণ্য।

<[৫৮]> উক্ত চারটি বিষয় হলো কথা, কাজ, সম্মতি ও কিয়াস।

<[৫৯]> কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, সম্মতির মাধ্যমে বা কিয়াসের মাধ্যমে অর্জিত বিধিবিধানের উপর নির্ভর করে ইজমা সম্পাদিত হয়। কারণ ইজমা সম্পাদিত হয় গ্রহণযোগ্য ও আস্থাশীল আলেমদের মাধ্যমে। আর আলেমগণ শরীয়তের দলীল হতে কোনো ভাবেই যা প্রমাণিত নয় এমন কোনো রায় দিতে পারেন না। সুতরাং শরীয়তের উৎস হতে নির্গত হয়নি এমন কোনো ইজমা কখনও ঘটতে পারে না। অন্যভাবে বললে যখনই কোনো বিষয়ে ইজমা প্রমাণিত হবে তখন এটা নিশ্চিত যে উক্ত বিষয়ে কোরান হাদীসের কোনো না কোনো দলীল রয়েছে সেটা আমাদের নিকট পৌছাক বা না পৌছাক। কোনো আয়াত বা হাদীস মানসুখ হয়েছে এটা কিভাবে জানা যায় সে প্রসঙ্গে ইমাম নাব্বী বলেন,

ومنها ما يعرف بالتاريخ ومنها مه يعرف بالاجماع كقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالاجماع والاجماع لا ينسخ ولاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم

কখনও কখনও তারীখের মাধ্যমে জানা যায় (অর্থাৎ যে হাদীসটি পরে এসেছে সেটি গ্রহণ করতে হবে আর যেটি আগে এসেছে সেটি মানসুখ মনে করতে হবে) আবার কখনও কখনও ইজমার মাধ্যমে জানা যায় যেমন মদপানকারীকে চতুর্থবারে হত্যা করার বিধানটি মানসুখ হয়ে গেছে এটা ইজমার মাধ্যমে প্রমানিত। ইজমা কোনো কিছুকে মানসুখ করে না নিজেও মানসুখ হয় না তবে ইজমার মাধ্যমে বোঝা যায় যে উক্ত বিধানটি মানসুখ হওয়ার কোনো দলীল আছে।

[শারহে মুসলিম]

একটি হাদীস সম্পর্কে ইবনে জারীর তাবারী বলেন,

وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به وإذا كان كذلك فهو منسوخ والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر والله أعلم

এই বিধানটির কেউ গ্রহণ করেছে বলে আমি জানি না যদি এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে ওটা মানসুখ আর ইজমা যদিও মানসুখ করে না তবে তা প্রমাণ করে যে এই বিপরীত কোনো দলীল রয়েছে যা এই বিধানকে রহিত করে যদিও তা আমাদের নিকট প্রকাশ না পায়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

তবে এই সকল বিষয়ের মধ্যে পুরোপুরি অকাট্য নয় এমন কোনো বিষয়ে যদি ইজমা সম্পাদিত হয়ে যায় তাহলে উক্ত বিষয়ে প্রবল ধারণা (غلبة الظن) নিশ্চিত বিধানে রুপান্তরিত হয়। <৬০> শরীয়তের দলীল প্রমানের উৎস সমূহের বাইরে ইজমা নিজেই

---

[উমদাতুল কারী]

এক কথায় কোনো বিষয়ে ইজমা সম্পাদিত হলে যদি উক্ত বিষয়ের বিপরীত কোনো দলীল পাওয়া যায় তবে ধরে নিতে হবে অন্য কোনো দলীল দ্বারা তা মানসুখ হয়ে গেছে যেহেতু এটা অসম্ভব যে সমগ্র উম্মতের আলেমরা কোনো দলীল ছাড়ায় কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে ইজমা করবেন।

<৬০> অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যদি শরীয়তের দলীল ছাড়া স্বাধীনভাবে কোনো ইজমা প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে ইজমার আলাদা কি গুরুত্ব রয়েছে? লেখক এখানে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কথা, কাজ, সম্মতি ইত্যাদি উৎস হতে বিধান নির্ণয় করার সময় আলেমদের মাঝে বিভিন্ন রক মতপার্থক্য হয়ে থাকে। এই সকল বিধিবিধানের উপর কিয়াসের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান অন্য বস্তুর উপর প্রয়োগ করার সময় আরো অধিক মতপার্থক্য হয়ে থাকে। এই সকল মতপার্থপূর্ণ বিষয়ের কোনো একটিতে যখন ইজমা সম্পাদিত হয় তখন উক্ত মতটি অকাট্য ও চুড়ান্ত সত্য প্রমাণিত হয় এবং অন্যান্য সম্ভাবনাগুলো দুর করে দেয়।

লেখক বলেছেন ইজমার মাধ্যমে প্রবল ধারণা অকাট্য সত্যে পরিনত নয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো,

জন্নে গালিব (الظن الغالب) বা গলাবাতুজ-জন (غلبة الظن) বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ে প্রবল ধারণা জন্মানো। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে শাফাক (شفق) ডুবে গেলে মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয় এবং ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। আরবী ভাষায় শাফাক (شفق) শব্দটি দুটি অর্থে ব্যাবহৃত হয়।

১ . সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে যে লাল রং থাকে এটা বোঝাতে।

২ . উক্ত লাল রঙের পর যে সাদা রঙ প্রকাশিত হয় সেটা বোঝাতে।

বিভিন্ন দলীল প্রমানের উপর চিন্তাভাবনা করে ইমাম শাফেঈর নিকট মনে হয়েছে হাদীসে লাল রঙকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অপর দিকে ইমাম আবু হানীফার নিকট মনে হয়েছে সাদা রঙকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকে তার নিকট যে ধারণা প্রবল মনে হয়েছে সেই অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। যদি উক্ত মাসয়ালার কোনো একটি মতে ইজমা সম্পাদিত হতো তবে যে মতটিতে ইজমা সম্পাদিত হলো সেটির পক্ষে যারা আছেন তাদের প্রবল ধারণা অকাট্য সত্যে পরিনত হতো আর অন্য পক্ষের মতটি

কোনো স্বাধীন উৎস নয়। কেননা যদি ইজমা শরীয়তের উৎস সমূহের কোনো একটির দিকে প্রত্যাবর্তন না করতো তবে আল্লাহর রসুলﷺএর পরও শরীয়ত আছে এমন প্রমাণিত হতো। <[৬১]>

وَأَمَّا الْمَعَانِي الْمُتَدَاوَلَةُ الْمُتَأَدِّيَةُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ اللَّفْظِيَّةِ لِلْمُكَلَّفِينَ، فَهِيَ بِالْجُمْلَةِ: إِمَّا أَمْرٌ بِشَيْءٍ، وَإِمَّا نَهْيٌ عَنْهُ، وَإِمَّا تَخْيِيرٌ فِيهِ. وَالْأَمْرُ إِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْجَزْمُ وَتَعَلَّقَ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ سُمِّيَ وَاجِبًا، وَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ وَانْتَفَى الْعِقَابُ مَعَ التَّرْكِ سُمِّيَ نَدْبًا، وَالنَّهْيُ أَيْضًا إِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْجَزْمُ وَتَعَلَّقَ الْعِقَابُ بِالْفِعْلِ سُمِّيَ مُحَرَّمًا وَمَحْظُورًا، وَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْحَثُّ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ عِقَابٍ بِفِعْلِهِ سُمِّيَ مَكْرُوهًا، فَتَكُونُ أَصْنَافُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَلَقَّاةُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ خَمْسَةً: وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ، وَمَحْظُورٌ، وَمَكْرُوهٌ، وَمُخَيَّرٌ فِيهِ وَهُوَ الْمُبَاحُ

শরীয়তের উৎসহ সমূহ হতে মানুষের উপর যেসকল বিধিবিধান প্রযোজন্য হয় তা হয়তো কোনো কিছুর প্রতি আদেশ হবে অথবা নিশেধ হবে অথবা দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি করার স্বধীনতা প্রদান করা হবে। যদি আদেশ হতে দৃঢ়তা বোঝা যায় ও তা পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে এমন প্রমাণিত হয় তবে তা ওয়াজিব (ফরজ) বলে গন্য হবে আর যদি এর মাধ্যমে কাজটি করলে সওয়াব না করলে শাস্তি নেই এমন বোঝা যায় তবে তা মুস্তাহাব নামকরণ করা হবে। একইভাবে নিশেধ হতে যদি দৃঢ়তা বোঝা যায় ও তাতে লিপ্ত হলে শাস্তি হবে এমন প্রমানিত হয় তবে তার উক্ত বিষয়কে হারাম বলা হবে আর যদি তা থেকে উক্ত বস্তুটি ত্যাগ করা উত্তম কিন্তু তাতে লিপ্ত হলে কোনো পাপ নেই এমন প্রমাণিত হয় তবে এটাকে মাকরুহ নাম করন করা

---

পরিত্যাজ্য হতো। ইজমা জন্নে গালিব বা প্রবল ধারণাকে অকাট্য সত্যে পরিনত করে বলতে লেখক এটাই বুঝিয়েছেন।

<[৬১]> কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে আল্লাহর রসুলের পর শরীয়তের নতুন কোনো বিধান প্রণিত হবে না। অতএব ইজমা স্বাধীনভাবে কোনো বিধান প্রতিষ্ঠিত করে না বরং শরীয়তের যেসব বিধান বর্ণিত আছে সেগুলোর উপর আলেমরা চিন্তাভাবনা করেন। চিন্তা ভাবনার ফলে আলেমদের মাঝে কোনো কোনো বিধানে দ্বিমত হয কোনোটিতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটিতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় সেটিকে ইজমা বলা হয় যা অকাট্য বলে প্রমাণিত হয়।

হয়। মোট কথা উপরে বর্ণিত উৎস সমূহ হতে শরীয়তের যেসব বিধিবিধান অর্জিত হয় তা পাঁচ প্রকার। (১) ফরজ (২) মুস্তাহাব (৩) হারাম (৪) মাকরুহ (৫) যা করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে আর তা হলো মুবাহ। <[৬২]>

وَأَمَّا أَسْبَابُ الِاخْتِلَافِ بِالْجِنْسِ فَسِتَّةٌ: أَحَدُهَا: تَرَدُّدُ الْأَلْفَاظِ بَيْنَ هَذِهِ الطُّرُقِ الْأَرْبَعِ: أَعْنِي: بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عَامًّا يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ، أَوْ خَاصًّا يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ، أَوْ عَامًّا يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ، أَوْ خَاصًّا يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ، أَوْ يَكُونَ لَهُ دَلِيلٌ خِطَابٍ، أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ.

وَالثَّانِي الِاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي الْأَلْفَاظِ، وَذَلِكَ إِمَّا فِي اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ كَلَفْظِ الْقُرْءِ الَّذِي يَنْطَلِقُ عَلَى الْأَطْهَارِ وَعَلَى الْحَيْضِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُ الْأَمْرِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَلَفْظُ النَّهْيِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ؟

وَأَمَّا فِي اللَّفْظِ الْمُرَكَّبِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: ১৬০] فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْفَاسِقِ فَقَطْ، وَيُحْتَمَلَ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْفَاسِقِ وَالشَّاهِدِ، فَتَكُونَ التَّوْبَةُ رَافِعَةً لِلْفِسْقِ وَمُجِيزَةً شَهَادَةَ الْقَاذِفِ.

وَالثَّالِثُ: اخْتِلَافُ الْإِعْرَابِ، وَالرَّابِعُ: تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ، الَّتِي هِيَ: إِمَّا الْحَذْفُ، وَإِمَّا الزِّيَادَةُ، وَإِمَّا التَّقْدِيمُ، وَإِمَّا التَّأْخِيرُ، وَإِمَّا تَرَدُّدُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الِاسْتِعَارَةِ.

وَالْخَامِسُ: إِطْلَاقُ اللَّفْظِ تَارَةً، وَتَقْيِيدُهُ تَارَةً أُخْرَى، مِثْلَ إِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ فِي الْعِتْقِ تَارَةً، وَتَقْيِيدِهَا بِالْإِيمَانِ تَارَةً.

وَالسَّادِسُ: التَّعَارُضُ فِي الشَّيْئَيْنِ فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتَلَقَّى مِنْهَا الشَّرْعُ الْأَحْكَامَ بَعْضَهَا مَعَ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ التَّعَارُضُ الَّذِي يَأْتِي فِي الْأَفْعَالِ أَوْ فِي الْإِقْرَارَاتِ، أَوْ تَعَارُضُ الْقِيَاسَاتِ أَنْفُسِهَا، أَوِ التَّعَارُضُ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: أَعْنِي مُعَارَضَةَ الْقَوْلِ لِلْفِعْلِ أَوْ لِلْإِقْرَارِ أَوْ لِلْقِيَاسِ، وَمُعَارَضَةَ الْفِعْلِ لِلْإِقْرَارِ أَوْ لِلْقِيَاسِ، وَمُعَارَضَةَ الْإِقْرَارِ لِلْقِيَاسِ.

আর মতপার্থক্যের কারণ ছয়টি।

---

<[৬২]> এ বিষয়গুলো খুবই স্পষ্ট যা কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

একঃ শব্দসমূহ এই চারটি বিষয়ের মাঝে দোদুল্যমান থাকা। <[৬৩]> অর্থাৎ হয়তো শব্দটি আম হবে কিন্তু তার মাধ্যমে খাস উদ্দেশ্য হবে বা শব্দটি খাস হবে কিন্তু তার মাধ্যমে আম উদ্দেশ্য হবে বা আম হবে এবং তার মাধ্যমে আমই উদ্দেশ্য হবে বা খাস হবে এবং তার মাধ্যমে খাসই উদ্দেশ্য হবে। <[৬৪]> অথবা তার কোনো দালীলে খিতাব

---

<[৬৩]> চারটি বিষয় বলতে লেখক মৌখিকভাবে প্রাপ্ত বিধিবিধান সমূহক অর্জনের পদ্ধতিকে যে চারভাগে ভাগ করেছেন সেটা বোঝাচ্ছেন পরবর্তীতে তিনি নিজেই অবশ্য সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

<[৬৪]> এ বিষয়ে বিস্তারি আলোচনা পূর্বে করেছি (১১ ও ১২ নং টিকা দ্রষ্টব্য)। এই সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে মতপার্থক্যের কারণ হলো হয়তো কোনো আলেম বলবেন এই আয়াতটি খাস হিসাবে এসেছে এবং খাসই উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য জন বলবেন না বরং এখানে আম উদ্দেশ্য যেমন একটি আায়াতে আল্লাহ বলেন,

{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣]

আর তোমাদের স্ত্রীদের ঐ সকল মেয়েরা যারা তোমাদের কোলে পালিত হয়। [নিসা/২৩]

এই আয়াতে বিশেষভাবে স্ত্রীর অন্য পক্ষের যেসব মেয়েরা পরবর্তী স্বামীর কোলে পালিত হয় তাদের হারাম বলা হচ্ছে। এ থেকে কোনো কোনো আলেম বলেছেন স্ত্রীর অন্য পক্ষের যে সব মেয়েরা পরবর্তী স্বামীর গৃহে পালিত হয় না বরং দূরে পালিত হয় উক্ত স্বামীর জন্য ঐ মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ। কিন্তু জমহুর আলেমের মতে আয়াতে যদিও খাসভাবে শুধু কোলে পালিত মেয়েদের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এখানে আমভাবে স্ত্রীর সকল মেয়েদের হারাম করা উদ্দেশ্য।

একটি হাদীসে শস্যের যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ

যা কিছু আকাশ ও ঝর্ণার পানিতে বা কোনো সেচ ছাড়ায় জন্মায় তাতে দশ ভাগের একভাগ ফরজ আর যা কিছুতে সেচ দেওয়া হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ফরজ। [বুখারী]

অন্য হাদীসে এসেছে,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

পাঁজ ওয়াসাকের নিচে কোনো খেজুরে যাকাত নেই। [বুখারী]

থাকবে বা থাকবে না। <[৬৫]>

---

ইমাম আবু হানীফা উপরের হাদীসটি যা কিছু শব্দের আম অর্থ হতে জমিতে যা কিছু জন্মায় তার পরিমান যায় হোক তাতে যাকাত ফরজ এমন মত দিয়েছেন তবে অন্য সকল ইমামদের মতে এখানে পরবর্তী হাদীসটি যেহেতু খাস তাই এটার মাধ্যমে উপরের হাদীসটির আম অর্থকে খাস করা হবে। তারা বলেছেন পাচ ওয়াসাকের নিচে কোনো শস্যে যাকাত নেই।

একইভাবে আল্লাহ বলেন,

{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]

কোরআনের যতটুকু সহজ হয় পাঠ করো [ মুয্যাম্মিল/২০]

একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ একজনকে সলাত শিক্ষা দিতে যেয়ে বললেন,

ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

তারপর কোরআনের যতটুকু তোমার জন্য সহজ হয় তা পাঠ করো। [বুখারী]

অন্য হাদীসে এসেছে রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

যে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার সলাত হবে না। [সহীহ বুখারী]

ইমাম আবু হানীফা উপরের আয়াত ও হাদীস যেখানে বলা হয়েছে যতটুকু সহজ হয় পাঠ করো এর আম অর্থের উপর নির্ভর করে বলেছেন সূরা ফাতিহা বা অন্য যে কোনো সূরা পাঠ করলেই সলাত হয়ে যাবে তবে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ফরজ নয়। যদি কেউ এটা পড়তে ভুলে যায় তবে তার সলাত আদায় হয়ে যাবে সলাতের ভিতর মনে পড়লে তাকে সাহু সাজদা করতে হবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ এর মতে সূরা ফাতিহা সলাতের রুকুন সমূহের একটি। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বা ভুলে সূরা ফাতিহা না পড়ে তবে তার সলাত আদায় হবে না। তাদের দলীল নিচের হাদীসটি। যেহেতু উপরের হাদীসটি আম ও নিচেরটি তাই খাসের মাধ্যমে আমকে খাস করতে হবে।

এভাবে আলেমদের মাঝে দ্বিমত হয়ে থাকে।

<[৬৫]> দলীলুল খিতাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৩২ ও ৩৩ নং টিকাতে হয়েছে। এর কারণে আলেমদের মাঝে কিভাবে দ্বিমত হয় তাও আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর মধ্যে প্রশিদ্ধ বিষয়টি হলো যাকাতের ক্ষেত্রে মাঠে চড়া পশু ও বাড়িতে খাওয়া পশুর ব্যাপারটি। রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

দুইঃ শব্দে যে ইশতিরাক (اشتراك) বা দৈত অর্থ থাকে সে কারণে। এটা হতে পারে কোনো একক শব্দে যেমন কুরু (قروء) শব্দটি। এটি হায়েজ ও তুহর উভয় অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হয়। <[৬৬]> একইভাবে আদেশ সূচক শব্দ (صيغة الامر) এর মাধ্যমে ফরজ বুঝতে হবে নাকি মুস্তাহাব এবং নিশেধ সূচক শব্দে (صيغة النهي) হারাম বুঝতে হবে নাকি মাকরুহ। <[৬৭]>

---

في سائمة الغنم الزكاة

সেসব ছাগল খোলা মাছে চরে ফিরে খায় তাদের সংখা যখন ৪০ হয় তখন তার উপর একটি ছাগল যাকাত হিসাবে ফরজ হয়। [মুয়াত্তা মালিক]

সকল আলেমরা এই হাদীসের দালীলুল খিতাব গ্রহণ করে বলেছেন বাড়িতে খাওয়া পশুতে যাকাত নেই তবে ইমাম মালিক এই হাদীসের দালীলুল খিতাব গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন বাড়িতে খাওয়া বা মাঠে চরে খাওয়া সকল পশুতে যাকাত দিতে হবে।

<[৬৬]> কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকাকে ইশতিরাক (اشتراك) বলে আর উক্ত শব্দকে মুশতারাক (مشترك) বলে। এ বিষয়ে ১৬ নং টিকাতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইশতিরাকের কারণে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য হওয়ার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। যখন একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে তখন কোন অর্থটি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত হয়। যেমন শাফাক (شفق) বা কুরু (قروء) শব্দের ক্ষেত্রে হয়েছে।

<[৬৭]> ২০ এবং ২১ নং টিকাতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আমর বা আদেশ প্রদানের মাধ্যমে কখনও বাদ্যতামুলক বা ফরজ বোঝানো হয় কখনও মুস্তাহাব বোঝানো হয় একইভাবে নিষেধ করার মাধ্যমে কখনও হারাম বোঝানো হয় কখনও মাকরুহ বোঝানো হয়। এই দ্বৈত অর্থের কারণে এ বিষয়ে বহু স্থানে আলেমদের মাঝে দ্বিমত হয়েছে। যেমন ওযুতে নাকে পানি দেওয়া ফরজ কিনা এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ

যে কেউ ওযু করে যে নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলুক [ বুখারী ও মুসলি]

এই হাদীস অনসারে কেউ কেউ বলেছেন ওযুতে নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা ফরজ কিন্তু জমহুর আলেমের মতে এটা সুন্নাত। অর্থাৎ তারা এখানে আদেশের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বোঝেননি।

বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে গঠিত একটি বাক্যেও এই ধরণের ইশতিরাক হতে পারে <[৬৮]> যেমন আল্লাহর বাণী

{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: ٥]

যারা তওবা করে তারা ছাড়া [নুর/৫]

কেননা হতে পারে এটা শুধু ফাসিকের দিকে ফিরে যাবে আবার এমনও হতে পারে যে এটা ফাসিক ও সাক্ষী উভয় দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন (অপবাদ দান কারী) তাওবা করলে সে ফাসিক হওয়া থেকে মুক্তি পাবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। <[৬৯]>

---

<[৬৮]> অর্থাৎ দ্বৈত অর্থ বা ইশতিরাক যেমন একটি একক শব্দে হতে পারে যেমনটি কুরু (قروء) শাফাক (شفق), ইত্যাদি শব্দে আমরা দেখেছি একইভাবে একটি বাক্যের অর্থ নির্ণয়েও দুরকম সম্ভাবনার সৃষ্টি হতে পারে। লেখক পরবর্তীতে এর উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

<[৬৯]> সূরা নুরের একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٤، ٥]

নিশ্চয় যারা পবিত্র নারীদের অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী হাজির করতে সক্ষম না হয় তবে তোমরা তাদের ৮০ টি বেত্রাঘাত করো আর কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না আর ওরাই হলো ফাসিক। তাদের কথা ভিন্ন যারা তাওবা করে এবং সংশোধন হয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালূ। [নুর/৪,৫]

এখানে তওবা কারীর জন্য যে ভিন্ন বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে সেই ভিন্নতা কি শুধু ফাসেক হওয়ার ক্ষেত্রে নাকি সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও জমহুর আলেমের মত হলো উভয় ক্ষেত্রেই এই ভিন্নতা প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তাওবা করলে সে যেমন ফাসিক হওয়া থেকে বেচে যাবে একইভাবে তার সাক্ষও গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবু হানীফার মত হলো তাওবা করলে কেবল ফাসিক হওয়া থেকে বেচে যাবে তার সাক্ষ কখনওই গ্রহণ করা হবে না।

## তিনঃ ই'রাবের বিভিন্নতা <[৭০]>

---

এই ধরণের আরো অনেক সূক্ষ সূক্ষ বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত হয়ে থাকে।

<[৭০]> এই বিষয়টি অন্তত ব্যাপকতার অধিকারী। আরবী ভাষাকে সঠিক ভাবে বোঝার ও বলার জন্য যেসকল নিয়মকানুনের উপর দক্ষতা অর্জন জরুরী তর সমন্বয়কে ই'রাব (الاعراب) বলা হয়। এ সকল নিয়মকানুন আয়ত্ব করার জন্য খোদ আরবদেরও বহু পরিশ্রম ব্যায় করতে হয়। এসকল নিয়ম কানুনের উপর দক্ষতা অর্জন ছাড়া কেউ কোরান ও হাদীসে সঠিক অর্থ অনুধাবনে সক্ষম হতে পারে না।

ইবনে কাছীর বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে আব্দুল আজীজ ইবনে মারওয়ান নামের এক উমায়্যা খলীফার কাহিনীতে বলেন,

এক ব্যাক্তি একবার তার নিকট এসে তার জামাতা সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেন,

من خَتَنَكَ؟

তার উদ্দেশ্য ছিল তাকে প্রশ্ন করা যে, কে তোমার জামাতা? তার বলা উচিত ছিল মান খাতানুকা? কিন্তু তা এর উপর যবর পেশ দেওয়ার পরিবর্তে তিনি যাবর দিয়ে বলেন মান খতানাকা? এর অর্থ হয় তোমার খাতনা করিয়েছে কে? একথা শুনে উক্ত ব্যাক্তি বিব্রত বোধ করে বলে,

ختني الخاتن الذي يختن الناس

যে সবার খাতনা দেয় সেই আমার খাতনা করিয়েছে।

একথা শুনে খলীফা তার কাতিবকে বলেন এ কি বলছে? কাতিব বলল আপনার উচিত ছির "মান খতানুকা" এভাবে বলা।

[বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

সূরা তাওবার প্রথম আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

আল্লাহ এবং তার রসুল মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন।

এই আয়াতের রসুল শব্দটি ফাইল হিসাবে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। উমর ﷺ এর সময় একজন কারী এই আয়াতের রসুল শব্দটিতে যের দিয়ে পড়ছিল। যাতে অর্থ হয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার রসুল থেকে (নাউযু বিল্লাহ)। একথা শুনে এক গ্রাম্য লোক বলল,

إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء

যদি আল্লাহ তার রসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন তবে আমিও তার থেকে বিচ্ছিন্ন।

উক্ত কারী ঐ গ্রাম্য লোকটিকে উমর ﷺ এর নিকট হাজির করলে সে সব খুলে বলল। ঘটনা শুনে উমর ﷺ মানুষকে আরবী ভাষার ব্যাকারণ শিক্ষা করার নির্দেশ দিলেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে উমর ﷺ একবার সূরা নাহলের ৪৭ নং আয়াতের { أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ} [النحل: ৪৭] অংশটুকুর অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। তিনি উপস্থিত সকললে বিষয়টি জানালে হুজাইল গোত্রের একজন কবি বলল আমাদের ভাষায় তাকওউফ (تخوف) শব্দটি কমতি অর্থ ব্যাবহৃত হয়। উমর ﷺ তাকে বললেন এ বিষয়ে কি তোমার কোনো কবিতা জানা আছে? সে একটি কাবিতা পড়ে শুনালে উমর ﷺ বললেন,

يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم

হে মানুষ সকল তোমাদের উচিত জাহিলিয়্যাতের সময়ের কবিতাগুলো মুখস্থ রাখা কেননা তাতে তোমাদের কিতাবের (কোরআনের) তাফসীর জানা যায় এবং তোমাদের ভাষার অর্থ বোঝা যায়।

[তাফসীরে কুরতুবী]

মোট কথা কোরআন ও হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝতে হলে আরবী ভাষার উপর বিস্তারিত দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে।

আরবী ভাষার সূক্ষ সূক্ষ বিভিন্ন নিয়ম কানুনের উপর নির্ভর করেও অনেক সময় মতপার্থক্য হয়। যেমন ওযুর আয়াতে আল্লাহ ﷻ প্রথমে মুখ ও হাত ধোয়া তার পর মাথা মাসেহ করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলেন,

{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ৬]

এবং তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত।

একানে পা গিরা পর্যন্ত ধৌত করতে হবে নাকি মাসেহ করতে হবে তা নির্ভর করে (ارجلكم) শব্দের উপর যের দেওয়া হবে নাকি যবর দেওয়া হবে তার উপর। যের দেওয়া হলে সেটা মাথার মতো মাসেহ করার বিধান পাওয়া যাবে আর যবর দেওয়া হলে মুখ ও হাতের মতো ধৌত করার বিধান পাওয়া যাবে। এবিষয়ে আলেমদের মাঝে কিছু দ্বিমত রয়েছে যদিও জমহুর আলেমের মত এই যে, পা ধৌত করতে হবে।

চারঃ কোনো শব্দকে হাকীকত (حقيقة) বা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা হবে না মাযাঝ (مجاز) বা রুপক অর্থের বিভিন্ন প্রকার যেমন হাযফ (حذف), ঝিয়াদা (زيادة), তাকদীম (تقديم), তা'খীর (تأخير) ইত্যাদির কোনো একটি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে মতপার্থক্য অধবা হাকীকত ও ইস্তিয়ারা এর মধ্যে কোন অর্থ গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকা। <[৭১]>

---

<[৭১]> কোনো শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে ব্যাবহার করাকে হাকীকত (حقيقة) বলা হয়। কখনও কখনও কোনো শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হয় না এই অবস্থাকে মাযাঝ (مجاز) বলা হয়। ইস্তিয়ারা (استعارة) অর্থ ধার করা। কোনো শব্দকে তার নিজ অর্থের পরিবর্তে অন্য অর্থে ব্যাবহার করাকে ইস্তিয়ারা (استعارة) বলে। ইস্তিয়ারা (استعارة) মাযাঝ (مجاز) এরই একটি রুপ। ৫ নং টিকাতে আমরা হাকীকত ও মাযাঝের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহ বলেন,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]

তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা সুতা কালো সুতা হতে পৃথক হয়ে যায়। [ সূরা বাকারা/১৮৭]

এখানে কালো সুতা ও সাদা সুতা বলতে আকাশের কালো রেখা ও সাদা রেখাকে বোঝানো হয়েছে।

লেখক ইসস্তিয়ারা কে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মাযাঝের তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। আসলে তিনি মাযাঝ ও ইস্তিয়ারার মাঝে পাথর্ক্য করেছেন। ইস্তিয়ারা (استعارة) অর্থ ধার করা আর মাযাঝ (مجاز) অর্থ সীমা অতিক্রম করা। অর্থাৎ যখন সরাসরি একটি শব্দকে তার প্রকৃত অর্থ ছাড়া ভিন্ন অর্থে বোঝানো হয় তখন সেটাকে ইস্তিয়ারা বলা হয় যেমন উপরের আয়াতে সুতা বলতে আকাশের সাদা বা কালো রেখাকে বোঝানো হয়েছে। আর যখন কোনো শব্দ দ্বারা তার অর্থের নিকটবর্তী অর্থ প্রকাশ করা হয় তখন সেটাকে মাযাঝ বলে যেমন আল্লাহর বাণী,

{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]

আপনি এই অঞ্চলকে প্রশ্ন করুন [ইউসুফ/৮২]

এখানে বলা হচ্ছে আপনি এই অঞ্চলকে প্রশ্ন করুন অথছ উদ্দেশ্য হলো এই অঞ্চলের লোকদের প্রশ্ন করু। দেখা যাচ্ছে অঞ্চল শব্দটি উভয় স্থানেই রয়েছে। তাহলে ইস্তিয়ারা ও মাযাঝের মধ্যে পার্থক্য হলো ইস্তিয়ারা বলতে একটি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি বস্তুর জন্য ব্যাবহার করা আর মাযাঝ হচ্ছে

উক্ত শব্দটিকে ব্যাবহার করতে যেয়ে সামান্য সীমা অতিক্রম করা। অর্থাৎ তার অর্থের কাছাকাছি অর্থে ব্যাবহার করা তবে পুরো পুরি তার প্রকৃত অর্থে নয়। তবে আলেমদের নিকট ইস্তিয়ারা (استعارة) মাযাঝ বলেই গণ্য এবং একটি শব্দকে যে কোনো ভাবে তার প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো অর্থে ব্যাবহার করলে সেটা মাযাঝ বলেই গণ্য হবে।

লেখক মাযাঝের তিনটি প্রকারের কথা বলেছেন।

ক . হাযফ (حذف) বা উহ্য রাখার কারণে।

আরবীতে কখনও কখনও কিছু শব্দ উহ্য রাখার মাধ্যমে মাযাঝের সৃষ্টি হয় যেমনটি আমরা উপরের আয়াতে দেখেছি। সেখানে বলা হয়েছে,

{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]

আপনি এই অঞ্চলকে প্রশ্ন করুন [ইউসুফ/৮২]

এখানে মূল শব্দটি ছিল এমন,

اسأل أهل القرية

আপনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট প্রশ্ন করুন।

অর্থাৎ আহল (أهل) শব্দটি উহ্য রাখার কারণে এখানে মাযাঝের সৃষ্টি হয়েছে।

খ . ঝিয়াদা (زيادة) বা বাড়তি অংশের কারণে।

অনেক সময় কিছুটা বাড়তি শব্দ যোগ করার কারণে মাযাঝের সৃষ্টি হয় যেমন আল্লাহ বলেন,

{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } [الشورى: ١١]

তার (আল্লাহর) সমকক্ষ কেউ নেই [শুরা /১১]

সরাসরি অর্থ করলে এই আয়াতের আর্থ হয়,

তার সমকক্ষের মতো কেউ নেই

এমন অর্থ করলে তার সমকক্ষ কেউ একজন আছে এমন বোঝা যায়। মোট কথা এখানে (ك) শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে যার অর্থ মতো ওটা বাদ দিলে অর্থ হবে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

গ. আত-তাকদীম ওয়াত-তা'খীর (التقديم والتأخير) অর্থাৎ শব্দের আগ পেছ করার কারণে।

## পাঁচঃ কোনো শব্দকে এক স্থানে শর্ত সাপেক্ষে উল্লেখ করা আর অন্য স্থানে

অনেক সময় যে শব্দটি আগে আসার কথা ছিল সেটা পরে আসার কারণে মাযাঝের সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

{فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا} [هود: ٧١]

তখন সে হেসে ফেললো পরে আমি তাকে পুত্র (সন্তানের) সুসংবাদ দিলাম [হুদ/৭১]

কোনো কেনো আলেম বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ফলে সে হেসে ফেলল।

এভাবে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবাহৃত হয়। কখনও কখনও কোনো শব্দ তার প্রকৃত অর্থ বোঝাচ্ছে নাকি রুপক অর্থ বোঝাচ্ছে সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য হয় ফলে কোনো বিষয়ে তাদের রায় বিভিন্ন হয়। তায়াম্মুমের আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]

অথবা তোমরা স্ত্রীদের স্পর্ষ করো [নিসা/৪৩]

এখানে স্পর্ষ করা বলতে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক প্রকৃত অর্থ বা হাকীকত বুঝেছেন সেকারণে কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে হাত দ্বারা স্পর্ষ করলেই ওযু ভেঙে যাবে এমন মত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা এখানে স্পর্ষ বলতে সহবাস করা বুঝেছেন সেকারণে তিনি স্পর্ষ করাকে ওযু ভঙ্গের কারণ হিসাবে মনে করেন নি।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]

তোমাদের পিতারা যেসব নারীদের সাথে নিকাহ্ করেছে তোমরা তাদের সাথে নিকাহ্ করো না। [নিসা/২২]

আয়াতে ব্যাবহৃত নিকহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কোনো ভাবে কোনো স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া আর রুপক অর্থ কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করা। ইমাম শাফেই প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন সেকারণে যদি কারো পিতা কোনো মেয়ের সাথে যিনা করে থাকে তবে উক্ত মেয়ে ছেলের উপর হারাম হবে না এমন মত দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা এখানে দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন সেকারণে এই মাসয়ালাতে বিপরীত মত দিয়েছেন।

শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা। যেমন এক আয়াতে দাস মুক্তি করার ব্যাপারে শর্ত ছাড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে আর অন্য আয়াতে মুমিন হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। <[৭২]>

ছয়ঃ যত পন্থা ও পদ্ধতিতে শরয়ীতের বিধিবিধান গৃহিত হয় তার প্রতিটিতে একে অপরের সাথে বৈপরিত্ব থাকা। <[৭৩]> একইভাবে আল্লাহর রসুলের জীবনে একই বিষয়ে দুইরকম কর্ম নীতি পাওয়া যাওয়া বা সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রেও বৈপরিত্ব থাকা

---

<[৭২]> শর্তহীনভাবে উল্লেখ করাকে মুতলাক (مطلق) ও শর্তসাপেক্ষে উল্লেখ করাকে (مقيد) বলা হয়। ৩২ নং টিকার শেষের দিকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখনে শুধু একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

জিহারের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]

দাস মুক্ত করা। [মুজাদিলা/৩]

কোনো মুমিন ব্যাক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করার কাফ্ফারার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]

একজন মুমিন দাস মুক্ত করা [নিসা/৯২]

এখানে প্রথম আয়াতটি মুতলাক আর দ্বিতীয় আয়াতটি মুকায়্যাদ। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈর মতে জিহারের কাফ্ফারাতেও মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে যদিও উক্ত আয়াতে মুমিন শব্দটি উল্লেখ নেয়। তারা এখানে জিহারের আয়াতটিকে হত্যার কাফফারা সংক্রান্ত আয়াতটির শর্তের অধীন মনে করেছেন। অনেক আলেম অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটিকে আরেকটির সাথে মিলান নি। তারা জিহারের ক্ষেত্রে মুমিন দাস হওয়া শর্ত করেন নি।

<[৭৩]> ভিন্ন ভিন্ন আয়াত বা হাদীসে একই বিধান বিভিন্নভাবে বর্ণিত হওয়া। এটাকে তায়ারুদ (تعارض) বলা হয়।

বা স্বয়ং কিয়াসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকা। <[৭৪]> অথবা এই তিনটি প্রকারের একটির সাথে অন্যটির বৈপরিত্ব থাকা যেমন কথার সাথে কাজের, সম্মতির বা কিয়াসের বৈপরিত্ব। কাজের সাথে, সম্মতি বা কিয়াসের বৈপরিত্ব। সম্মতির সাথে কিয়াসেই বৈপরিত্ব। <[৭৫]>

---

<[৭৪]> যেমন হায়েজ গ্রস্থ মহিলা হায়েজ অবস্থায় যে সলাত আদায় করে না তা পরে পড়ে দিতে হয় কিন্তু যে সওম পরিত্যাগ করে তা কাজা আদায় করে দিতে হয়। এধরণের বিভিন্নতা থাকার কারণে অন্য কোনো বিষয় এর উপর কিয়াস করার সময় মতপার্থক্যের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

<[৭৫]> এক কথায় শরীয়তের যে কোনো দুটি দলীলের মাঝে তায়ারুদ (تعارض) বা বৈপরিত্ব থাকা। যখন কোনো বিধানের ব্যাপারে শরীয়তের দুটি দলীলের মধ্যে তায়ারুদ (تعارض) থাকে তখন তার সামাধানের জন্য আলেমরা দুটি পন্থা গ্রহণ করেন,

১ . জামা' (جمع) বা সমন্বয়সাধন।

২ . তারজীহ (ترجيح) বা বাছাইকরণ।

**১ . জামা' (جمع) বা সমন্বয়সাধন।**

পরস্পরের সাথে বৈপরিত্ব বা তায়ারুদ (تعارض) রাখে এমন দুটি বিধানের মাঝে সমন্বয় সাধন করার জন্য দুটি পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়।

**ক . আমকে খাস এর মাধ্যমে বাখ্যা করা।**

যদি আম ও খাসের মাঝে তায়ারুদ (تعارض) থাকে তবে আলেমরা সেটাকে তায়ারুদ মনেই করেন না। কারণ আমরা আগেই বলেছি খাস আমের তুলনায় শক্তিশালী সেকারণে খাসের অর্থকে প্রধান্য দিয়ে আমকে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ২২১]

তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিবাহ করো না। [বাকারা/২২১]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ৫]

এবং তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যকার সতি নারীদের [ মায়েদা/৫]

ইসলামী পরিভাষায় ইয়াহুদী বা খৃষ্টান মেয়েরাও মুশরিক। সে হিসাবে উপরের আয়াতে মুশরিক মেয়েদের হারাম করা হচ্ছে আর নিচের আয়াতে নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম মেয়েদের বৈধ ঘোষণা করা হচ্ছে। এখানে উপরের আয়াতটি আম আর নিচের আয়াতটি খাস সুতরাং নিজের আয়াতের খাস অর্থ অনুযায়ী উপরের আয়াতটির আম অর্থকে খাস করা হবে। অর্থাৎ সকল প্রকারের মুশরিক মেয়ে আর অবৈধ থাকবে না বরং আহলে কিতাবী মেয়েরা বৈধ হবে।

একই কথা জিনাকারীকে বেত মারা সম্পর্কিত আয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেখানে আমভাবে সকল প্রকারের জিনাকারীকে বেত মারতে বলা হয়েছে কিন্তু হাদীসে বিবাহিত জিনাকারীকে রজম করতে বলা হয়েছে। এখানে উভয় দলীলেল মাঝে কোনো বৈপরিত্ব বা তায়ারুদ (تعارض) নেই বরং খাস দলীলটির উপর নির্ভর করে বিবাহিত জেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে আর অবিবাহিতদের বিধার পূর্বের মতই থেকে যারে অর্থাৎ তাদের বেত মারা হবে।

খ . আমরের সীগা দ্বারা ফরজ না বুঝে মুস্তাহাব বুঝা বা নাহীর সীগা দ্বারা হারাম না বুঝে মাকরুহ বুঝা।

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

কেউ যেনো দাড়িয়ে পানি পান না করে যে ভুলে যায় সে যেনো বমি করে ফেলে।

অন্য একটি হাদীসে আলী ؓ হতে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ ﷺ দাড়িযে পানি পান করেছেন। ইমাম নাব্বী উভয়ের মাঝে সমন্বয় করছে বলেন নিষেধাঙ্গা সংক্রান্ত হাদীসটি হারাম বোঝানোর জন্য নয় করং কারাহাত (كراهة) বা অপছন্দনীয়তা বোঝানোর জন্য আর পরবর্তী হাদীসটি জওয়াঝ (جواز) বা বৈধতা বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ সাধারণত দাড়িয়ে পানি পান না করা উচিত কিন্তু সেটা করা হারামও নয়।

এভাবে একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

যে কেউ তার বিশেষ অঙ্গ স্পর্ষ করে সে যেনো ওযু করে। [আবু দাউদ]

অন্য হাদীসে একজন ব্যাক্তি বিশেষ অঙ্গ স্পর্ষ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

قَالَ الْقَاضِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَإِذْ قَدْ ذَكَرْنَا بِالْجُمْلَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، فَلْنَشْرَعْ فِيمَا قَصَدْنَا لَهُ، مُسْتَعِينِينَ بِاللَّهِ، وَلْنَبْدَأْ مِنْ ذَلِكَ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ عَلَى عَادَاتِهِمْ.

কাজী # (লেখক) বলেন, যেহেতু আমরা এই সকল বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা সেরে নিলাম অতএব এখন আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়ে আমাদের মূল উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেষ করবো। <[৭৬]> আমরা ফুকাহায়ে কিরামের অভ্যাস অনুযায়ী

---

وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْكَ

ওটা তো তোমার একটি অঙ্গ মাত্র। [তিরমিযী]

অনেকে এই হাদীসদুটির মাঝে সমন্বয় করে বলেছেন প্রথম হাদীসটিতে বিশেষ অঙ্গ স্পর্ষ করার মাধ্যমে যে ওযু করার কথা বলা হয়েছে উক্ত আদেশটি ফরজ অর্থে নয় বরং মুস্তাহাব অর্থে আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে যে ওযুর প্রয়োজনিয়তা নেই বলা হচ্ছে এটা বৈধতা বা জাওয়াঝ (جواز) অর্থে।

**২ . তারজীহ (ترجيح) বা বাছাইকরণ।**

যদি দুটি দলীলের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তবে দুটি তাদের একটিকে একটিকে গ্রহণ করতে হয় এবং অন্যটি পরিত্যাগ করতে হয়।

ক . যদি উভয় বিধানের কোনটি আগে এবং কোনটি পরে তা জানা সম্ভব হয় তবে পরের বিধানটি গ্রহণ করা হয় এবং আগেরটি মানসূখ (منسوخ) বা রহিত মনে করা হয়।

সহীহ মুসলিমে এসেছে,

وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ

রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবারা আল্লাহর রসুলের আদেশ সমূহের মধ্যে পরবর্তী আদেশটির অনুসরণ করতেন। [সহীহ মুসলিম]

খ . যদি তারীখ জানা না যায় তাহলে হাদীসের সনদ, রাবী, অন্যান্য বিধানের সাথে সামাঞ্জস্যতা ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে যে কেনো একটিকে বাছায় করা হয়।

<[৭৬]> আমিও সম্পূর্ণ বইটি অনুবাদ করার আশা রাখি আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

সমাপ্ত

কিতাবুত তাহারা (كتباب الطهارة) থেকে শুরু করবো।

## লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

**প্রকাশের অপেক্ষায়**

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)  ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)